সুমনা দাস সুর

জলজ দর্পণ এক : ছোটোগল্পে চিত্রকল্প

অ্যালিস নামে সেই ছোট্ট মেয়েটির গল্প আমরা সবাই জানি। ওয়েস্টকোট পরা এক ব্যস্তসমস্ত খরগোশের পিছু ধাওয়া করে সে খরগোশের গর্তে ঢুকে পড়েছিল। আর তারপরেই একের পর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ছেলেবেলায় পড়া এই গল্পে অ্যালিসের মজাদার ও রংবেরঙের অভিজ্ঞতাগুলি শৈশবের সবুজ মাঠ পেছনে ফেলে আসার পর ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসে, ছেঁড়া ঘুড়ি, রঙিন বল কিংবা হাতভাঙা পুতুলের মতো একসময় হারিয়েও যায়, যেমন হারিয়ে যায় রাক্ষস-খোক্কস কিংবা লালকমল-নীলকমলেরা। শুধু মনে থেকে যায় অ্যালিসের খরগোশের গর্তে ঢুকে পড়ার ঘটনাটি। যেন সেটা কোনো রহস্যময় জগতের গোপন প্রবেশপথ। হয়তো সে পথ পৌঁছে যাবে পিরামিডের গর্ভগৃহে ওষধি-সংরক্ষিত সম্রাটের মমির সামনে, কিংবা হিমশৈলের আঘাতে ডুবে যাওয়া প্রমোদতরণীর সাগরতলের মাটিতে গেঁথে থাকা কোনো গোপন প্রকোষ্ঠে। অথবা, কোনো বিজ্ঞানী অনেক বিনিদ্র রজনী অনেক ভুল দরজায় কড়া নাড়ার পর হঠাৎই পেয়ে যান সেই পথটি যা তাঁকে নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত আবিষ্কারের দিকে। মৌমাছির মতো একটি শব্দ হয়তো এসে গুঞ্জন তুলে যায় কবির মনে, তারপর সে আবার উড়ে যায় নীল আকাশের দিকে, প্রস্ফুটিত ফুলের দিকে। সাদা কাগজের ওপর খোলা কলম রেখে অনেকগুলো দিন কাটানোর পর একসময় তিনি অনুভব করেন, সেই মৌমাছি আরও অনেক মৌমাছিদের ডেকে এনেছে। তারা যূথবদ্ধ হয়ে চাক তৈরি করছে, তাতে সঞ্চয় করছে মধু। স্থানু কলম সচল হয়ে ওঠে, কবি পেয়ে যান সেই পথ যা দিয়ে মধু ক্ষরিত হয়ে ভরে তুলবে পত্রপুট।

এই একঘেয়ে অভ্যাসের সাদাকালো জগৎটার মধ্যেই কোথাও লুকোনো আছে সেই রহস্য, মাটির তলায় খরগোশদের গোপন কেল্লার মতো। অ্যালিসের 'ওয়ান্ডারল্যান্ড' তাই আসলে হারিয়ে যায় না, লুকিয়ে থাকে। যে চায়, সে খুঁজে নেয়। দুর্গম পথে অভিযাত্রা বা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের মতোই কৌতূহল এবং রোমান্সের কুহক মাখা সেই অবগুণ্ঠনমোচন। শব্দের ঘোমটার তলায় অনিঃশেষ রহস্যের হাতছানি, সুদৃশ্য পাড়ের ফাঁক দিয়ে চকিত চাহনির গোপন আহ্বান— কবিতার চিত্রকল্প বা image এমনভাবেই ডাক দেয় পাঠককে, যার ফলে তার ভাবনা বাঁধা সড়ক ছেড়ে, চোরকাঁটায় ভরা পোড়ো জমি আর নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে, উধাও প্রান্তরের শেষে মেঘ ছোঁয়া নীল পাহাড়ের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমায়।

১

স্থির জলে যেমন গাছের ছায়া, নীল আকাশ আর মেঘের ছায়া, উড়ন্ত চিলের ছায়া পড়ে, তেমন, কবিতার জন্মলগ্ন থেকেই তাতে প্রতিফলিত হয় জীবনের নানা টুকরো ছবি। কিন্তু শুধুই কি

নিটোল ছবি? হাওয়া দিলে আয়নাটা যখন ভেঙে যায়, তখন সেই টুকরো টুকরো প্রতিবিম্বগুলিও কি সত্যি নয়! এই বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনার সূচনা বিংশ শতকের গোড়ায়, ভিক্টোরিয়ান যুগের গদগদ আবেগের বাহুল্য থেকে কবিতাকে মুক্ত করার তাগিদে। অভিব্যক্তিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য কথায় তৈরি ছবির ভাবনা আসে। কবিতাকে চৈতন্যহীন আবেগ থেকে মুক্ত করতে Imagist আন্দোলনের সূচনা, যাকে প্রথম সুস্পষ্ট রূপ দেন এজরা পাউন্ড, ১৯১২ সালে Poetry পত্রিকায়। ১৯১৩ তে এই পত্রিকাতেই লেখা 'A Few Don'ts by an Imagist' প্রবন্ধে 'Imagism' এর সংজ্ঞা এবং সেইসঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা প্রশ্নের উত্তর দেন পাউন্ড। কাকে বলে Image ? পাউন্ড বলেন, "An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in am instant of time."[১] এখানে 'complex' শব্দটি এক 'মুক্তি'র দ্যোতনা আনতে ব্যবহার করেন পাউন্ড, পূর্বনির্ধারিত এবং সুনির্দিষ্ট ভাবনার মোড়ক খুলে দিতে। কবিতার মধ্যে সযত্নে গাঁথা Image হবে প্যান্ডোরার অলৌকিক বাক্সের মতো, একেক পাঠে উঠে আসবে একেক রকমের ছবি, মহার্ঘ্য রত্ন বা শুধুই উদাস বিষণ্ণতা। যেমনটি কিনা বলেছিলেন বুদ্ধদেব বসু, "চিত্রকল্প ও প্রতীকের ব্যাখ্যা যাই হোক না কার্যত, তাদের এক দিকে থাকে চিত্ররচনা, আর অন্য দিকে এক গভীর রহস্য, যাতে জাল ফেলে আমরা তুলে আনতে পারি—হয়তো শূন্যতা, হয়তো এক মুঠো শামুক, হয়তো কখনো মুক্তো বা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর কখনো যার স্তরে স্তরে ডুবে গিয়ে বহু রত্ন উদ্ধার করে আনি।"[২]

'Imagism' এর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যায় কোথাও যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছিল, তাই, ১৯১৬ তে এক নতুন পরিভাষা ব্যবহার করলেন পাউন্ড— 'Vorticism'[৩]। এখানে তিনি স্পষ্ট করেন যে 'Imagism' কোনো আঙ্গিকের আন্দোলন নয়, নয় তা 'Symbolism'-এর সমার্থক, যেখানে কিছু কিছু সাদৃশ্যের সূত্র ধরে ধাঁধার উত্তর খোঁজা চলে। সেই উত্তরও সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত, অনেকটা পাটিগণিতের সংখ্যার মতো। পক্ষান্তরে, Image-এর ব্যবহার বীজগণিতের এককগুলির মতো। অনির্দেশ্য ও সম্ভাবনাময়। ছবি আঁকার জন্য চিত্রকরের লাগে কোনো রঞ্জক পদার্থ যা দিয়ে তিনি ইচ্ছে মতো রং বানিয়ে নিতে পারবেন। কবির কাছে সেই রঞ্জক পদার্থটি হোল, Image। ছবি আঁকিয়ে সেই রংকে সেইভাবেই তাঁর ছবিতে ব্যবহার করেন যেভাবে তিনি তাকে দেখেন বা অনুভব করেন। বাস্তবের অনুকরণ বা দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সেখানে বড় কথা নয়। ঠিক একইভাবে একথা কবিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ নিজের অভিজ্ঞতার এক 'কবিতার মুহূর্তের' কথা বলেন পাউন্ড। প্যারিসের মেট্রোরেলে ভ্রমণ করার সময় একদিন চলমান জনতার মধ্যে অপস্রিয়মাণ কয়েকটি মুখ তাঁর চোখে পড়ে এবং সেগুলি মনে গেঁথে যায়। মনের মধ্যে সারাদিন তারা ঘুরে ফিরে আসে এবং দিন শেষে হঠাৎই এক ঝলক আলোর মতো জেগে ওঠে, কথা নয়, যেন ছড়িয়ে দেওয়া একমুঠো রং। তারপর সেই রং শব্দের রূপ নেয়। তাঁর মনে হয়, তিনি যদি ছবি আঁকিয়ে হতেন, যদি তাঁর আয়ত্তে থাকতো রং-তুলির ব্যবহার, তবে হয়তো এক নতুন ধারার ছবির জন্ম হোত। কিন্তু সেসব কখনোই হোত না কেবল সুন্দর কিছু মুখের ছবি। বরং তা ভেঙেচুরে তৈরি অন্য কোনো অভিব্যক্তি, যেমন করেছিলেন পিকাসো। কিন্তু সেসব ছবি সমালোচকদের তৃপ্ত করতে পারতো না, তাঁদের ভ্রূ

উত্থিত হোত, তাঁরা বিদ্রূপ শানাতেন। কারণ, তাঁরা তাকেই নম্বর দেন যাকে ভালো বলে, উপভোগ্য বলে জানতে শিখেছেন। তাঁদের শিল্পভাবনা শিল্পবস্তুর খোসাতে এসে থেমে যায়, ভেতরে ঢুকতে পারে না। তাঁরা সেটাই ভাবতে পারেন বা ভাবতে চান যা ইতিমধ্যেই কেউ না কেউ ভেবে ফেলেছে।

কিন্তু, পাউন্ড মনে করেন, সত্যিকারের মননশীল তো তাঁকেই বলা হবে যিনি তাঁর চিন্তার গতিপথকে পূর্বনির্ধারিত বা চর্চিত ভাবনার বাইরে নিয়ে যেতে পারেন। আর তিনিই প্রকৃত শিল্পী যিনি তাঁর নিজস্ব রঞ্জক উপাদান ব্যবহার করে তৈরি করতে পারেন এমন কোনো রং যা আগে কেউ কখনো ব্যবহার করেনি। ঠিক এইখান থেকেই তৈরি হয় 'Vortex'-এর ধারণা। কোনো অনুভূতি বা আবেগ মনের মধ্যে প্রথম যখন জন্ম নেয় তখন তা থাকে অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত। Vortex সেই আদি (primary) রূপটিকে ধরার চেষ্টা করে। সদ্য ভূমিষ্ঠ অভিব্যক্তিগুলিকে তুলে আনতে চায়, কারণ তারপরেই তারা ব্যবহৃত, জীর্ণ হতে শুরু করবে। হারাবে তার দাঢ্য, তীব্রতা। তবে Vortex-এর অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ প্রিজমের মধ্যি দিয়ে বিচ্ছুরিত বর্ণালীতে পাউন্ড চিরন্তন ও শাশ্বতকে দেখেন। ইউক্লিডের জ্যামিতি যেমন শুধুমাত্র সমীকরণ নয়, তার মধ্যে বিশ্বচরাচরকে দেখার এক সত্যদৃষ্টি নিহিত আছে, তেমনই কবিতার Image এবং Vortex। গাণিতিক সমীকরণের এক সম্প্রসারিত রূপ সেখানে দেখেন পাউন্ড যেখানে a, b, cর বদলে থাকে রাত্রির আকাশ, পাহাড়ের চূড়া, সমুদ্রের ঢেউ। Image তাই কোনো আইডিয়া নয়, দীপ্যমান নক্ষত্রপুঞ্জের মতো ভাবনাপুঞ্জ। পরিণততর চিন্তায় তা হোল Vortex যেখানে নিত্যজায়মান আবেগ ও অনুভূতিগুলি ক্রমাগত প্রবিষ্ট ও নির্গলিত হচ্ছে।

পাউন্ড এবং তাঁর সহযোগী কবিরা যখন কবিতার Image-এর কথা বলেন তখন সেখানে পূর্বজ কবি ও কবিতার প্রতি বিরূপতা ও বিরুদ্ধতার ঝাঁঝ সহজেই টের পাওয়া যায়। হয়তো সেটাই স্বাভাবিক কারণ লড়াইটা যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার সেখানে কণ্ঠস্বর কিছুটা উঁচু হতেই পারে। এর কিছু বছর পরে ১৯৪৬ সালে আইরিশ কবি-সমালোচক সিসিল ডে-লুইস কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যে বক্তৃতাগুলি দেন, সেই 'ক্লার্ক বক্তৃতামালা' পরের বছর ১৯৪৭ এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় *The Poetic Image* নামে। ডে লুইসের আলোচনার পরিসরটি তুলনায় অনেক ব্যাপ্ত। Imagist আন্দোলনের বহু আগে শেক্সপিয়ার কিংবা রোমান্টিক কবিদের লেখায় যেমন তিনি দেখেছেন চিত্রকল্পের সুস্পষ্ট অভিজ্ঞান, তেমন চিত্রকল্পের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্ষেপ, কবিতা ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যিক জঁরগুলিতে Image বা চিত্রকল্পের ব্যবহার বিষয়েও আলোচনা করেন।

ডে-লুইস মনে করেন, কবিরা বহু বছর ধরে কবিতায় Imageএর ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন, অথচ সমালোচকেরা করেছেন উপেক্ষা। কিন্তু Image যে শুধুমাত্র সাজগোজ, গয়নাগাটি কিংবা কেকের ওপরে সাজানো চেরি নয় সেকথা যখন প্রথম স্পষ্ট ভাষায় বলেন কোলরিজ তখন তিনি প্রায় এক অলৌকিক ক্ষমতাবলে পরবর্তী সময়ের কবিতাকে ছুঁয়ে ফেলেন। অবশ্য কোলরিজ এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন যে Image এর প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা খর্ব হতে পারে।

ডে-লুইস বলেন, উপমা-অলঙ্কার-বিশেষণের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একটি Image গড়ে উঠতে পারে কিংবা নিরলংকৃত একটি বর্ণনাও হতে পারে Image। আবার তা হতে পারে বাস্তব অভিজ্ঞতার হুবহু সদৃশ, ওক কাঠের আসবাবের মতো তাকে স্পর্শ করা যায়, বার্নিশের গন্ধ ওঠে। কিন্তু সেটি যখন আমাদের কল্পনার দরজায় টোকা দেয় তখন আর বর্ণনামাত্র থাকে না। তা হয়ে ওঠে এমন এক আয়না যেখানে কেবলমাত্র বাইরের মুখচ্ছবি প্রতিফলিত হয় না, মুখের ভিতরে লুকিয়ে থাকা অন্য মুখগুলির ছায়াও পড়ে সেখানে। ডে-লুইসের মতে, Image অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃশ্যময়। এমনকি যেখানে ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ত নয়, সেখানেও এক সুদূর দৃশ্যময়তা কাজ করে। তাই প্রথমেই তিনি Image এর একটি সরল এবং একরৈখিক সংজ্ঞা দেন, "In its simplest terms, it is a picture made out of words"[৪]। কিন্তু কথা দিয়ে ছবি তো একজন সাংবাদিকও তৈরি করতে পারেন, তাকে তো 'Poetic Image' বলা যাবে না। শুধু কথায় ছবি তৈরি নয়, তাকে গভীর আবেগ এবং বোধের দ্বারা জারিত হতে হবে। তাই আরও একধাপ এগিয়ে ডে-লুইস বলেন, "Are we any nearer to it if we say that a poetic image is a word-picture charged with emotion or passion ?"[৫] সুনিশ্চিত সংজ্ঞা দেন না, রেখে দেন প্রশ্নচিহ্ন কারণ, ডে-লুইস জানেন অস্থির নবীন পৃথিবীর মতো Image এর গঠনে ও সংজ্ঞায় সুনির্দিষ্ট কোনকিছু নেই, সে নিয়ত নির্মীয়মান ও পরিবর্তনশীল। সুতরাং সংজ্ঞা নির্ণয়ে মনোযোগ ব্যয় না করে ডে-লুইস খোঁজেন, Image বা চিত্রকল্পের অভিপ্রায়টি কি।

Image কোনো বস্তুর পুনর্নির্মাণ করে না বরং কোনো বস্তুর নিরিখে একটি অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ করে। ফলে, বস্তুটি নিরাবলম্ব থাকে না, সম্পর্কযুক্ত হয়। এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত হওয়া Image বা Metaphor এর ধর্ম। এগুলি ব্রহ্মাণ্ডের ধারণার সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করায় যেমনভাবে প্রাচীন মহাকাব্যিক বা পৌরাণিক মিথগুলি কিংবা বিজ্ঞানের কোনো যুগান্তকারী আবিষ্কার এক ব্যাপ্ত ভুবনের ধারণা নিয়ে আসে। মহাকাব্য এবং পুরাণকাহিনি একসময় মানুষের জীবনের পথপ্রদর্শক ছিল। বিরূপ বিশ্ব এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তাকে এগিয়ে চলতে সাহায্য করেছে। কিন্তু একসময় সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই poetic myth গুলির প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তার বদলে এসেছে poetic image, যাকে ডে-লুইস বলেন ব্যক্তির নিজস্ব মিথ (myth of individual)। Poetic myth তৈরি হোত যৌথ চৈতন্যের (collective consciousness) ভাণ্ডার থেকে আর poetic image যৌথ চেতনার কাছে স্বীকৃতি খোঁজে, স্বীকৃতি খোঁজে যৌথ অস্তিত্বের কাছে। এই যৌথতার কারণেই কবিতায় যখন একটি পাখির মৃত্যুর কথা বলা হয়, তখন তা যে আমাদের আঘাত করে, কবি বাল্মিকীতে রূপান্তরিত রত্নাকর দস্যু থেকে কোলরিজের প্রাচীন নাবিক আবিষ্কার করেছিল সেকথা।

বিজ্ঞানী নিলস্ বোর দেখিয়েছিলেন বিশ্বের ক্ষুদ্রতম একক একটি অণুর গঠনের যে প্যাটার্ন তা গ্রহনক্ষত্রের গতিপ্রকৃতির প্যাটার্নের সঙ্গে সদৃশ। সেই প্যাটার্নটাকে ভেঙে দিলেও তা আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। বোর বলেন, মানুষের মনও এমন এক প্যাটার্নকে খোঁজে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে ভাঙাচোরা, ছন্দহীন বলে মনে হয় তারও মধ্যে নিহিত আছে কোনো ছন্দ।

বিজ্ঞানী হমবোল্ট বলেন, এই ভৌতজগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে এক আভ্যন্তরীণ যোগসূত্র বিদ্যমান। প্রতিটি শক্তি, প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এই পরস্পর নির্ভরতাকে আবিষ্কার করার মধ্যেই খোঁজ মেলে এক আনন্দের। কেননা, মানুষের মনে পূর্ণতা ও সুষমার জন্য এক আকাঙ্ক্ষা কাজ করে।

কবিতার চিত্রকল্প পাঠককে যে আনন্দ দেয় তাও পূর্ণতার সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব খুঁজে পাওয়ার আনন্দ। অনেক আপাত আকস্মিক, চমকে দেওয়ার মতো সাদৃশ্যের সঙ্গতিতে গড়ে উঠতে পারে চিত্রকল্প, কিন্তু তা যখন পরিচিত জগৎটার ওপর থেকে অভ্যাসের পরদাটা সরিয়ে দেয় তখন বিচ্ছিন্ন একটা মানুষ হঠাৎই নিজেকে বিশ্বের অন্তর্গত সুষমার মধ্যে আবিষ্কার করে, সেই অনুভূতিই আনন্দের। বিশ্বরহস্যের অন্দরমহলে প্রবেশের চাবিকাঠি এই image। যা কিছু ছিল, আছে, থাকবে এবং চোখে দেখার, কানে শোনার জগতের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করে। এই বিশ্বচরাচরের সমস্ত প্রাণি এবং জড়বস্তু যেন মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম সুতোয় গাঁথা, জালে কোনো ছোঁয়া লাগলে কম্পন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। Image এর শব্দবাণ সেই বিকীর্ণ অস্তিত্বের অদৃশ্য জালে কাঁপন তোলে।

Image বা চিত্রকল্প নিয়ে ছকভাঙা নতুন ভাবনার সূত্রপাত কবিতার পরিসরে কিন্তু তার মানে এই নয় যে চিত্রকল্প শুধুমাত্র কবিতার বাগদত্ত। বরং শিথিল, এলায়িত গজেন্দ্রগামিনী কবিতাকে মেদহীন ঋজুতা দিতে যেমন বিদ্যুৎগর্ভ চিত্রকল্পের প্রয়োজন অনুভব করেছেন কবিরা তেমন নিছক আখ্যাননির্মাণ থেকে বেরিয়ে আসতে ঔপন্যাসিক বা গল্পকারেরা সেই বিচিত্ররূপিণীর আবাহন করেছেন। আবার সংলাপ নির্ভর নাটকেও পাথরে পাথরে ঘর্ষণে ছিটকে ওঠা আগুনের ফুলকির মতো তৈরি হয় আলোকিত কিছু ছবি। সেই সমস্ত চিত্রকল্প শুধুমাত্র যে সাহিত্যসৃষ্টিকে বহুস্তরান্বিত এবং দীপ্যমান করে তোলে তা নয়, লেখকের মনের বীথিপথ ধরেও হেঁটে চলে আলো হাতে, এমনটাই বলেন ক্যারোলাইন স্পার্জন, শেক্সপিয়রের নাটকে চিত্রকল্পের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে[৬]। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর *The Waves* উপন্যাসটি গর্ভাশয়ের মতো কেন্দ্রীয় একটি চিত্রকল্পের চারপাশে ফুলের পাপড়ির মতো বিকশিত, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। হেরমান মেলভিলের *Moby Dick* কিংবা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের *The Old Man and the Sea* উপন্যাসেও আমরা দেখি, একটি ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর মানুষ এবং অনন্ত প্রসারিত রহস্যময় সমুদ্রের মধ্যে চলে যে ভালোবাসা, ঘৃণা, ক্রোধ, উৎকণ্ঠায় মেশানো আশ্চর্য দ্বিরালাপ, সেখানে ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে অজস্র চিত্রকল্প। বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিটোল প্লটে টানটান গল্প বলার আঁটোসাঁটো বাঁধুনির ফাঁকেও খোলা রাখেন চিত্রকল্পের জানালা। *কৃষ্ণকান্তের উইলে* বারুণী পুষ্করিণীর সেই আশ্চর্য ছবি কি কখনো ভুলবে বাঙালি পাঠক, যেখানে জলে প্রতিফলন ঘটে প্রথমে মানুষের রূপের তারপর স্বরূপের! তবে উপন্যাসে চিত্রকল্পের কাব্যিক অনুপ্রবেশ অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে যখন *চতুরঙ্গে* পৃথিবীর এলানো বাহুর ওপর জেগে ওঠা নীলাভ সবুজ দ্বীপটি কিংবা জীবনের সব রং মুছে যাওয়া নদীর চরাটি চেতন অবচেতনের মাঝে যাতায়াত করে এবং মানুষের অস্তিত্বের মূলগত কিছু প্রশ্ন তুলে আনে। পরবর্তী সময়ের

লেখকদের উপন্যাসে চিত্রকল্প ক্রমশ আরও জটিল ও বহুমাত্রিক হয়ে উঠেছে, খাঁজকাটা হীরের মতো যা থেকে একেক সময় একেক রকম আলো বিচ্ছুরিত হয়।

ছোটোগল্প বয়সে উপন্যাসের চাইতে অনেকটা ছোট আর সেই কারণেই তার সময়টা আলাদা। উনিশ শতকের শেষভাগে যখন থেকে ছোটোগল্প লেখা হতে শুরু করেছে তখন মানুষ আর একটা গোটা মানুষ নেই, অনেকগুলি আলাদা আলাদা সত্তার কোলাজে তৈরি। তার কাজের জগৎ, তার গার্হস্থ্য, তার সাধ-স্বপ্ন, তার চেনা অচেনা সুখ দুঃখ—এই সবকিছুর জোড়ের জায়গায় সূক্ষ্ম কিছু ফাঁক থেকে যায়। সেখানে তার পরিচয় পারিবারিক কিংবা পেশাদার, সৎ কিংবা সুবিধাবাদী কোনোটাই নয়। কিংবা বলা যায়, সেই সমস্ত পরিচয়ের খোলস থেকে নরম, স্পর্শকাতর প্রাণিটি যখন একটু একটু করে বেরিয়ে আসে, তখন সে একা। সেই নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন মানুষটির কথা বলে ছোটোগল্প। ছোটোগল্পের স্বভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে তাই Frank O' Connor বলেন, '... an intense awareness of human loneliness'[৭] এই একাকীত্ব তো নির্বাসিতের নয়, শিল্পী, সাধক, খুনি কিংবা উন্মাদেরও নয়, সাধারণত। বরং অভ্যাসের ডেলি প্যাসেঞ্জারি, বাধ্যতামূলক বাড়ি ফেরা, ছেলের হোমওয়ার্ক, চায়ের আড্ডা, শ্যালিকার বিয়েতে সম্মানরক্ষার উপহার, ক্রিকেট থেকে ক্রোমোজমের গঠন, পরমাণু বিস্ফোরণ থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন— সবেতেই সে আছে। আবার হয়তো নেইও। উপন্যাসের ডিপ্ ফোকাসে থাকাটা যতটা ধরা পড়ে, না-থাকাটা ততটা নয়। ছোটোগল্পের অগভীর ফোকাসে উঠে আসে কেবল কয়েকটি মুহূর্ত, অন্ধকার ঘরে একটা দেশলাই জ্বলে ওঠে, দেখা যায় একটি মুখ এবং অস্পষ্ট অবয়ব, সেই মুখ উৎফুল্ল, চিন্তিত, বিষণ্ণ কিংবা উদাসীন। কাঠিটা পুড়তে যতটা সময় লাগে ততটুকুই এর পরিসর। ছোটোগল্পকার এই মুখটিকে যখন দেখান, তখন চারপাশের অস্পষ্ট পরিসরের সঙ্গে লগ্ন থেকেও সে আলাদা হয়ে যায়। ছুটন্ত ট্রেনের হাতল ধরে শরীরটাকে শূন্যে ভাসানোর মতো। প্রতি মুহূর্তে অন্ধকার আর মৃত্যুর হাতছানি কিন্তু চলমান জীবনের ট্রেনে ফিরে আসার নির্ভুল সময়জ্ঞান থাকে তাতে। ছোটোগল্প তো শুধুই ছোট করে গল্প বলা নয়, একটি মানুষ, যে নিজেই একা এবং কয়েকজন, তার ভোরের স্বপ্নের মতো, বুক পকেটে বয়ে বেড়ানো গোপন চিঠির মতো স্তরান্বিত সত্তাকে যখন স্বল্প পরিসরে রূপ দিতে হয় তখন গল্পকারকে হতেই হয় আঙ্গিক সচেতন। গল্পের বুনোটে টানা কাহিনি নয়, জটিল প্যাটার্নকে ফুটিয়ে তুলতে হয়, আর সেই নকশার মাঝে মাঝে গল্পকার গেঁথে দেন ছোট ছোট আয়না। চলতে ফিরতে যাতে আলো ঝলসে ওঠে, ছায়া ঘনিয়ে আসে, প্রতিফলিত হয় চলমান জীবন, নিসর্গ কিংবা মনের ভিতর মহলের নিঃশব্দ ভাঙাগড়ার ছবি। সেই কারণে, একেবারে গোড়া থেকেই ছোটোগল্পের শিল্পিত ইঙ্গিতময়তার উপযুক্ত আধার হয়ে উঠেছে চিত্রকল্প। পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার আন্তন চেখভের গল্প সংকলনের ভূমিকায় তাঁর গল্পের বিশেষত্ব বোঝাতে গিয়ে সম্পাদককেও তাই অবধারিত ভাবে গড়ে তুলতে হয় একটি চিত্রকল্প— "... reading them one gets the impression of holding life itself, like a fluttering bird, in one's cupped hands."[৮] এমনভাবে স্পন্দিত জীবনকে মুঠোয় পুরতে উড়ন্ত পাখিকে শব্দের অদৃশ্য খাঁচায় ভরতে হয়। সেই খাঁচাটা চিত্রকল্পের।

বাংলা ছোটোগল্প বিশেষভাবে আঙ্গিক সচেতন হয়ে ওঠে পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে। কিন্তু ভাগ্যগুণে একেবারে গোড়া থেকে, অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষে বাংলা ছোটোগল্পের জন্মলগ্নের সময় থেকেই পত্রিকার পাতা ভরানো কিংবা গল্পভুক্ পাঠকের খিদে মেটানোর দায় তাকে বহন করতে হয়নি। কিংবা বলা যায়, সেই দায় সে বহন করেছিল স্বচ্ছন্দ, নির্ভার ভঙ্গিতে, ফরমায়েশ মেটানোর বোঝা মাথায় নিয়ে নয়। সৌজন্য, অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'হিতবাদী', 'সাধনা', 'ভারতী', 'সবুজপত্র' এমনকি হালের 'দেশ' কিংবা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাতায় প্রকাশিত হয়েছে যে প্রায় একশর কাছাকাছি গল্প, তারা গুণগত বিচারে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে হথর্ন কিংবা পো, মপাসাঁ কিংবা চেখভ, হেমিংওয়ে কিংবা শেরউড অ্যান্ডারসনের গল্পের সঙ্গে কিন্তু বিষয় ও নির্মাণের দিক থেকে সেগুলি বিশুদ্ধ, অবিমিশ্র ও মৌলিক। বঙ্কিমচন্দ্র যত বড় লেখকই হোন, তাঁর উপন্যাস যে ইউরোপীয় মডেলের ছাঁচে গড়া তা অস্বীকার করার যো নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের মাটি ছেনে যে গল্প তৈরি করলেন তাতে কোথাও এতটুকু ভিন্‌দেশী গন্ধ নেই, নেই চেষ্টাকৃত আনিয়ে তোলা কিংবা ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। আর কি আছে তাতে? আছে বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে, সতেজ, নবীন দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখা, আছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎব্যাপী বিস্তৃত পরিসরে বহু বিচিত্র চরিত্রের আসা যাওয়া, আছে রূপকথা-কিংবদন্তী-মিথ ভেঙে ছোটোগল্পের প্রায় অলৌকিক উত্থান। আর আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অজস্র চিত্রকল্পের আনন্দিত উদ্ভাস।

সৃষ্টির পরিসরে ছবির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য আজীবনের। অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করে যখন নিজের ফেলে আসা সময়ের দিকে পেছন ফিরে চেয়েছেন, তখন সেই জীবনের মুহূর্তগুলি ছবি হয়ে এসেছে তাঁর কাছে। *জীবনস্মৃতি*র বালকটির বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু শ্রীকণ্ঠ সিংহ যেমন পেনসিলের একটানে আঁকা একটি ছবি হয়ে ওঠেন ('বৃদ্ধ একেবারে সুপক্ক বোম্বাই আমটির মতো—অম্লরসের আভাসবর্জিত—তাঁহার স্বভাবের কোথাও এতটুকু আঁশ ছিল না'[৯]) তেমন, পেনেটির গঙ্গাতীরে প্রকৃতিকে প্রথম কাছ থেকে দেখা, ঊষার প্রথম সূর্যকিরণ থেকে শুরু করে দিনগুলিকে উপভোগ করার অভিজ্ঞতাও একটা ছবি হয়ে ফিরে আসে তাঁর মনের আয়নায় ('. . . আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে'[১০])। জীবনের একেবারে শেষ লগ্নে পৌঁছে যখন কলমের বদলে তুলে নিলেন তুলি, তখন সেইসব ছবিও কিন্তু শুধুই ছবি হয়ে থাকলো না। মনোসমীক্ষক সুধীর কক্কর বলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবি, যাকে আমরা দেখি, তারাও কিন্তু কিছু দেখে[১১]। ঝুঁকে দেখে স্রষ্টার মনের গভীরে। অবগুণ্ঠিত মুখে দুটি বিষণ্ণ চোখ, অতিপ্রাকৃত নিসর্গ বারবার ফিরে আসে সেখানে। সারা জীবন ধরে যে ছবি লিখেছেন, সেই লেখাই হয়তো তিনি আঁকতে চাইলেন একসময়। আমরা তাই দেখি, কবিতা, নাটক, কথাসাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা অজস্র চিত্রকল্পের মধ্যে অবচেতন মন যেখানে বাক্‌রূপ লাভ করেছে, সেখানে তা আরও গভীর, স্তরান্বিত এবং বাস্তবকে আত্মীকরণ করে ছুঁয়ে আসে পরাবাস্তবের সীমানা। তাঁর আপাত অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিতে অনেক সময়তেই চিত্রকল্প সচেতন জগৎ থেকে

নিরুদ্ধ অবচেতনে, বাস্তব থেকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অতীতে যাতায়াতের রন্ধ্রপথগুলি খুলে দেয়। যেমন, 'নিশীথে'[১২] গল্পে দক্ষিণাচরণ তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর মনের গভীরে এক গোপন অপরাধবোধ নিয়েই মনোরমাকে বিবাহ করেন। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তিনি জানতেন, এই আত্মহত্যার দায় তাঁরই। ক্রমশ এই অপরাধবোধ রাহুর মতো গ্রস্ত করে তাঁর সমগ্র সত্তাকে। তাঁর অবচেতনে সঞ্চিত প্রথমা স্ত্রীর একটি আর্ত প্রশ্ন প্রায় যেন ভৌতিক উপায়ে ফিরে আসে মনোরমার সঙ্গে নিভৃতে কাটানো মুহূর্তগুলিতে। সচেতন মনের পার ভেঙে ধসে যাওয়া আত্মপ্রতিরোধ হেমন্তের পদ্মার চিত্রকল্পে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে, "ভয়ংকরী পদ্মা, তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশনির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপারে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এংব বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপঝাপ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।" 'মণিহারা'[১৩] গল্পের মণিমালিকার মনে কিন্তু কোনো অপরাধবোধ ছিল না যখন সে তার স্বামীর কর্মচারী মধুসূদনের সঙ্গে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গৃহত্যাগ করে। কারণ সে তার স্বর্ণালঙ্কারগুলি ছাড়া পৃথিবীতে কাউকে, কিছুকে কখনো ভালোবাসেনি। স্বামী ফণিভূষণের মনে কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ছিল এক অযৌক্তিক, অবুঝ ভালোবাসা। তাই অন্তর্হিতা মণিমালিকাকে খুঁজে পাওয়ার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হোল এবং একথা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গেল যে মণিমালিকা আর জীবিত নেই, তখনও ফণিভূষণ আকাঙ্ক্ষা করে সে যেখানেই থাকুক, এমনকি মৃত্যুর ওপার থেকে হলেও ফিরে আসুক। প্রায় অপ্রকৃতস্থ ফণিভূষণ তাই বাস্তব পৃথিবীর, চেতন জগতের দ্বার রুদ্ধ করে রাত্রির অন্ধকার নিঃসঙ্গতায় মণিমালিকার আবাহনের প্রতীক্ষা করে। রাত্রির আঁধার এবং অবচেতনের গাঢ় তমিস্রা মিলেমিশে রূপ নেয় চিত্রকল্প— "দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নিচেকার পল্লবের মতো একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত, আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে।" আবার 'ক্ষুধিত পাষাণ'[১৪] গল্পের কথকের যাত্রা ব্যক্তিগত স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে হারানো প্রিয়জনের কাছে নয়, একটি সময় থেকে অন্য একটি সময়ের দিকে। 'তুলার মাশুল আদায়কারী' লোকটি দিনের বেলা পশ্চিমী পোশাক পরে নিজাম সরকারের দপ্তরে কাজ করতে যায়, আর সন্ধ্যায় শা-মামুদের তৈরি দেড়শ বছরের পুরনো অট্টালিকায় ফিরে এসে সযত্নে ধারণ করে নবাবী আমলের উপযুক্ত বেশভূষা। কারণ, সে অনুভব করে এই প্রাসাদটি, যেটি বর্তমানে তার বাসগৃহ, সেখানে অতীত স্তব্ধ হয়ে আছে। এই অতীত ক্রমশ তাকে সম্মোহিত করে, সে সেই অতীতের মধ্যে প্রবেশের পথ খোঁজে। যেন, মঞ্চের কুশীলব এবং দর্শক — উভয়ের অবস্থান দুটি ভিন্ন স্তরে, দর্শকাসন থেকে উঠে একজন মঞ্চে প্রবেশ করতে চায়, মাঝে দেড়শ বছরের যবনিকা কম্পমান। এই বিমূর্ত অতীতাভিসারকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেন একটি চিত্রকল্পের আধারে— "বড়ো ইচ্ছা হইতে লাগিল, ভালো করিয়া দেখি, কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না; মনে হইল, ভালো করিয়া কান পাতিলেই উহাদের সমস্তই কথা স্পষ্ট শোনা যাইবে— কিন্তু একান্তমনে কান পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব শোনা যায়। মন হইল, আড়াই শত বৎসরের

কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে, ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে, কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।"

কয়েকটি উদাহরণে রবীন্দ্র ছোটোগল্পের চিত্রকল্প ব্যবহারের একটা আভাস দেওয়া যায় মাত্র। এমন আরও অজস্র ছড়িয়ে আছে বহু প্রসঙ্গে, বহু অনুষঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ 'কাব্যধর্মী' এমন একটা বিশেষণ একসময় প্রচ্ছন্ন নিন্দার্থে প্রচলিত ছিল, যাকে খণ্ডন করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু[১৫]। বলেছিলেন, 'কবিপ্রাণ যার নেই', তার পক্ষে 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো গল্প লেখা অসম্ভব। এর বাইরে, বুদ্ধদেবের মতে, গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্পই নিতান্ত বাস্তব ঘেঁসা। কিন্তু আমরা বলব, একটি-দুটি ব্যতিক্রম মাত্র নয়, গল্পগুচ্ছের প্রায় প্রতিটি গল্পে, এমনকি 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' বা 'শাস্তি'র মতো নিষ্ঠুর, বাস্তবনির্ভর গল্পেরও সম্পদ শুধুই বাস্তব নির্ভরতা নয়। তাঁর ছবিতে দেখা যায় গাঢ় রঙের সীমানায় সরু পাড়ের মতো কিছুটা ফাঁকা জমি থাকে। আলোকিত, উজ্জ্বল সেই ফাঁকটুকু না পেলে ছবি ফুটে উঠতো না, ভাষা পেতো না। গল্পেও সেই ফাঁকটুকু থাকে প্রান্তরসীমা ছুঁয়ে বয়ে চলা নদীর মতো যাতে ভেসে আসে কিছু উপমা, চিত্রকল্প, যারা গল্পের সীমিত পরিসরটিকে যুক্ত করে ব্যাপ্ত জীবনবোধের সঙ্গে। সি. ডে. লুইস বলেছিলেন, চিত্রকল্পগুলি বিশ্বরহস্যের গভীরে প্রবেশের পথ খুলে দেয়। একথা তিনি বলেছিলে, কবিতার চিত্রকল্প সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো বটেই, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

ছোটোগল্পের বাস্তব নির্ভরতার দাবি রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে উপমা-অলঙ্কার-চিত্রকল্পের মীনেকারির কাজ ক্রমশ লুপ্ত শিল্পে পর্যবসিত হয়। মুখের যাবতীয় দাগ, ভাঁজ সমেত রুক্ষ, অসজ্জিত চেহারাটাই গল্পকারেরা ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তাঁরা চান না ব্যক্তি মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বকে নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে স্থাপন করতে বরং চালচিত্র থেকে বিচ্ছিন্ন ভগ্ন মূর্তিগুলিকে তুলে আনেন খড় মাটি বেরিয়ে পড়া কদর্যতা সমেত। সেই সঙ্গে এও তো ঠিক, একই সঙ্গে মহৎ কবি এবং অসামান্য গল্পকারের সংযোগের মতো ঘটনা বিরল এবং 'মণিহারা', 'ক্ষুধিত পাষাণ' কিংবা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে'র মতো গল্পও একবারই লেখা হতে পারে। এ বরং বাংলা ছোটোগল্পের সৌভাগ্য যে পরবর্তী গল্পকারেরা তৈরি করে নিয়েছেন তাঁদের নিজস্ব পায়ে চলার পথ। তাদের বিষয় বদলেছে, আঙ্গিক বদলেছে, বদলেছে চিত্রকল্পও। ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত হয় টুকরো মুখ, কখনো মুখোশ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'জলসাঘর'[১৬]। সত্যজিৎ রায় এই গল্প অবলম্বনে যে ছবি তৈরি করেছেন তাতে বেশ কিছু বাঙ্ময় মুহূর্ত আমাদের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। গল্পটি পড়লে বোঝা যায়, সেই মুহূর্তের অনেকগুলিই সাহিত্যের ভাষা থেকে সিনেমার ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে, তাঁর লেখায় সামন্ততন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত কখনো গোপন থাকেনি অথচ তিনিই বারংবার, বিষণ্ণ উচ্চারণে বলেছেন তার ভাঙনের গল্প। এই ভাঙন তো শুধু সামন্তপ্রভুর বিত্তের নয়, আভিজাত্যের, বনেদিয়ানার। বিত্ত, স্বজন, সর্বস্ব হারিয়ে খাদের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে থাকা জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের গল্প 'জলসাঘর', যাঁর সঙ্গে প্রতিতুলনায় বারবার আসে উঠতি ব্যাবসাদার মহিম গাঙ্গুলির

কথা। রুচি-সংস্কৃতি-আভিজাত্যে বিশ্বম্ভরের ধারে কাছে পৌঁছতে না পারলেও এই যুগটা যে মহিমদের মতো বৈশ্যশক্তির এবং জুরাসিক যুগের বিশালাকায় প্রাণির মতো জমিদারেরা বিলুপ্ত হয়ে এই ক্ষিপ্র, চতুর প্রজাতিই টিকে থাকবে, একথা সমস্ত গল্পজুড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গল্পের শুরুর একটি চিত্রকল্পে ধরা থাকে সেই নির্যাস— "আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শুকতারা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ওই তারাটির সহিত যেন দীপ্তির প্রতিযোগিতা করিয়াই এ অঞ্চলের হালে বড়লোক গাঙ্গুলীবাবুদের প্রাসাদশিখরে বহুশক্তিবিশিষ্ট একটি বিজলি-বাতি অকম্পিত ভাবে জ্বলিতেছে।" শুকতারার অন্তিম হৃদস্পন্দন ক্রমশ সঞ্চারিত হয় গল্পের মধ্যে এবং শেষবারের মতো জ্বলে ওঠে জলসাঘরের আলো হয়ে। যদিও, সেই আলো জ্বলে অচিরে চিরদিনের জন্য নিভে যাবে বলেই— "ঝাড় ও দেওয়ালগিরির কতকগুলিতে শেজ না থাকায় বাতাসে বাতিগুলি নিবিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে তাই মধ্যে মধ্যে স্বল্পম্লান ছায়ারেখা দীর্ঘাকারে জাগিয়া উঠিয়াছে প্রচ্ছন্ন বিষণ্ণতার মত।"

অবশ্যই, রাঢ়ের জমিদারবংশের দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি কেবলমাত্র শোনান না তারাশঙ্কর, ভূমিপুত্র হওয়ার সুবাদে আঞ্চলিক বহু সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের বৃত্তি, পেশা, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস সমেত জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে। যে জীবন রাঢ়বঙ্গের বাউলের পোশাকের মতো, ছিন্ন, মলিন কিন্তু বর্ণাঢ্য। বলা বাহুল্য, সেই জীবন অনেকক্ষেত্রেই ছবি হয়ে ধরা দেয়। এর মধ্যে একটি আশ্চর্য গল্প 'ডাইনী'[১৭]। অশুভশক্তি এবং কৃষ্ণজাদুতে বিশ্বাস গ্রামীণ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বহুল প্রচলিত। বিশেষত, কোনো আকস্মিক ক্ষয়ক্ষতি বা মৃত্যুর সরাসরি কোনো ব্যাখ্যা যখন মেলে না তখন বৃহত্তর প্রজ্ঞার অভাবে তারা ধরেই নেয় এ কোনো অশুভ শক্তির কাজ। আর এমনভাবে, নিছক ধারণা থেকে, চেহারা বা স্বভাবের কোনো বিশেষত্বের কারণে, তাদেরই কোনো একজনকে তারা সনাক্ত করে বসে এই সবকিছুর হোতা বলে। ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে বা পিটিয়ে মারার মর্মান্তিক ঘটনা আজও কখনো কখনো উঠে আসে খবরের কাগজের পাতায়। তারাশঙ্করের গল্পে অবশ্য কথকের দৃষ্টির লেন্সটি সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ঘোরানো। শিক্ষিতের আধুনিক দৃষ্টি নয়, নিরক্ষর সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসী এবং স্বয়ং ডাইনির ভাবনার জগৎই এই গল্পের পয়েন্ট অব ভিউ। ডাইনির বাস জনহীন প্রান্তরের মতো এক মাঠে, এই নির্বাসন সে মেনে নিয়েছে স্বেচ্ছায়। কারণ, সুরধনি নামের কিশোরীটি যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে পৌঁছতে পৌঁছতে একসময় নিজেই বিশ্বাস করে বসে যে সে সত্যিই ডাইনি। তার আত্মীয় স্বজন থেকে চারপাশের সবকটি মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী, সে-ই তাদের বুকের রক্ত শুষে খেয়েছে। আত্মবিস্মৃতির এই ট্র্যাজেডিই গল্পের প্রাণ। ডাইনির ঊষর, রিক্ত অথচ ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব ও অন্তর্জগতের প্রতিরূপ হয়ে ওঠে 'ছাতি-ফাটার মাঠ', যেখানে তার বাস—"... ছাতি ফাটার মাঠের সে রূপ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর! শূন্যলোকে ভাসে একটি ধূমধূসরতা, তৃণচিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। ফ্যাকাশে রঙের নরম ধূলার রাশি প্রায় এক হাত পুরু হইয়া জমিয়া থাকে। গাছের মধ্যে এত বড় প্রান্তরটার এখানে ওখানে কতকগুলি খৈরী ও জাতীয় কন্টকগুল্ম। কোন বড় গাছ নাই—বড গাছ এখানে জন্মায় না, কোথাও জল নাই, —গোটাকয়েক শুষ্ক গর্ভ জলাশয় আছে, কিন্তু জল তাহাতে থাকে না।" এই মাঠ, যা পার হতে মানুষের ছাতি ফেটে যায়, আবার মাঠটির নিজেরও যেন ছাতি ফেটে গেছে আ-হৃদয় শুষ্কতায়। ঠিক ওই ডাইনির মতো, যার কাছে গেলে

মানুষ মারা পড়ে, আবার তার নিজের সহানুভূতিহীন, সঙ্গহীন অভিশপ্ত জীবনযাপন মৃত্যুর চাইতেও বড় মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বোষ্টমী'[১৮] গল্পে পদ্মাপারের গ্রামের আষাঢ়ের একটি শান্ত বিকেলের মেজাজটিকে ব্যক্ত করেছিলেন একটি অসামান্য চিত্রকল্পে— "কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন ভাবটা হয়, সকালবেলাকার বৃষ্টি অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে সেই ভাবটা ছিল।" বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত গল্প উপন্যাসকে ঘিরে থাকে বৃষ্টিধোয়া স্নিগ্ধতা, নরম আলোর আনাগোনা। তাই বলে নিষ্ঠুর রূঢ় জীবন থেকে তিনি মুখ ফিরিয়েছিলেন, এমনটা কিন্তু আদৌ নয়। বরং তাঁর গল্পে আমরা দেখি, গ্রামের গরীবঘরের মেয়ে শহরে গিয়ে পতিতাপল্লীতে নাম লেখায়, কালো বউকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে স্বামী ঝটপট সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনে, মেয়েলী স্বভাবের যুবক পরিবার এবং গ্রামের মানুষের উপহাসের পাত্র হয়ে ঠোক্কর খেতে খেতে ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে উঞ্ছবৃত্তি করে, নতুন প্রজন্ম পুরনো পেশা থেকে মুখ ফেরালে পরিত্যক্ত গ্রাম প্রায় শ্মশানের চেহারা নেয়— এমন আরও অনেক রংচটা, চুনবালি খসা জীবনের ছবি। তবু, প্রতিটি গল্পেই মিশে থাকে কান্নাধোয়া আঁখিপল্লবের কারুণ্য। তাঁর গল্পের চিত্রকল্পগুলিও রুক্ষ মাটিতে ধুলো উড়িয়ে চলে না, নরম ঘাসের উপর আলতো পা ফেলে। যেমন, 'পুঁইমাচা'[১৯] গল্পের ক্ষেন্তি নামের শান্ত, সরল, কিছুটা ভোজনপ্রিয় গ্রাম্য কিশোরীটির শ্বশুরবাড়িতে অনাদরে রোগে ভুগে মারা যাওয়ার ঘটনাটি পেছনে পড়ে থাকে। আর তার বাঁচার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, না মেটা সাধ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গল্পের পরিণতির চিত্রকল্পে— "তিনজনেই খানিক্ষণ নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিনজনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠোনের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল. . . যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে. . . বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডালগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া দুলিতেছে. . . সুপুষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।" ক্ষেন্তির মতো একটি মেয়েকে শুধুমাত্র খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকার অধিকারটুকু দিতেও যখন মানুষের সংসার কৃপণ, তখন তার নিজের হাতে লাগানো অনাদরের পুঁইগাছটির ওপর প্রকৃতি তার দান উজাড় করে দেয়। গাছটির মধ্যে যেন সেই মেয়েটির সত্তার পুনর্বাসন যাকে ধরিত্রীমাতা স্বয়ং নিজের কোলে টেনে নিয়েছে।

'ভণ্ডুলমামার বাড়ী'[২০] গল্পটি একটি কেন্দ্রীয় চিত্রকল্পকে লতার মতো জড়িয়ে গড়ে ওঠে। পাড়াগাঁয়ের মাইনর ইস্কুলের হেডমাস্টার অবিনাশবাবু এই গল্পের কথক, তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের স্মৃতি জুড়ে আছে স্বপ্নে বাস্তবে মেশা এই বাড়িটি। ছেলেবেলায় মামাবাড়ির গ্রামে গিয়ে বনজঙ্গলের মধ্যে একটি অসম্পূর্ণ কোঠাবাড়ি দেখেন তিনি। দিদিমার কাছে জানতে পারেন ওই বাড়িটি ভণ্ডুলের, গ্রাম সম্পর্কে ভণ্ডুলমামার। বদলির চাকরি তাই নিয়মিত দেখাশোনা করতে পারেন না। তারপর যখনই গ্রামে গেছেন, ওই বাড়িটির খোঁজ করেছেন। কখনো দেখেছেন, ঝোপ ঝাড় পরিষ্কার করে কাজ হচ্ছে আবার কখনো বা কিছুটা

কাজ এগিয়ে পড়ে আছে। একসময় ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আলাপও হয়, তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে গ্রামের বাড়ি সম্পূর্ণ করে বসবাস করবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু অর্থাভাবে বাড়ি আর কোনদিনই শেষ হয় না। ইতিমধ্যে সময় বদলে যায়, একসময়ের সমৃদ্ধ গ্রাম হারাতে থাকে তার গৌরব। পেশাগত কারণে কিংবা রোগব্যাধির ভয়ে গ্রামের পরবর্তী প্রজন্ম সকলেই শহরমুখী, এমনকি ভণ্ডুলমামার ছেলেরাও। কিন্তু ভণ্ডুলমামা সেই অসম্পূর্ণ বাড়িটিকে আঁকড়ে থাকেন এবং নিজের অজ্ঞাতেই বাঁচিয়ে রাখেন এক গ্রাম্য কিশোরের স্বপ্নকে। পরিত্যক্ত গ্রাম, ধ্বস্ত অর্থনীতির বাস্তবকে ছাপিয়ে বনজ গুল্ম আর আগাছায় ঘেরা বাড়িটি হয়ে ওঠে অনিঃশেষ, একটি অসামান্য চিত্রকল্প— "... আমার মনে হলো, ভণ্ডুলমামার বাড়ী উঠচে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন দিকে ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধরে... যেন অনাদিকাল, অনাদিযুগ ধরে ভণ্ডুলমামার বাড়ীর ইঁট একখানির পর আর একখানি উঠছে... শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ী হয়েই চলেচে... ওর বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।"

বয়সে শরৎচন্দ্রের চেয়ে দশ বছরের ছোট এবং তারাশঙ্করের থেকে বারো বছরের বড় জগদীশ গুপ্ত, 'কল্লোল'-এর অধিকাংশ লেখকেরও বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি। কিন্তু মানসিকতার দিক থেকে কোনো ঘরানা বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত করা যায়না তাঁকে। তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণের প্রগাঢ় হৃদয়ানুভূতি এবং অস্ত্যর্থক জীবনবোধের থেকে অনেক দূরে তাঁর জগৎ, আবার 'কল্লোলীয়' বাস্তবতার চাইতেও তার চরিত্র আলাদা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাঁর গল্পের চরিত্রদের শুধুই 'শরীর শরীর', 'মন নাই', এমনকি নেই মস্তিষ্কও, অন্তত নিয়ন্ত্রক ভূমিকায় নেই। সেই মাংসল দেহসর্বস্বতাকে তুলে আনেন জগদীশ গুপ্ত নিরাবেগ ভাষায়, সংক্ষিপ্ত, কাটা কাটা বাক্যবিন্যাসে। এই স্টাইল গল্পের বিষয়ের পরিপূরক, নিয়তির অমোঘতা এতে যেন আরও গমগম করে ওঠে। চিত্রকল্পের ব্যবহার তাই জগদীশ গুপ্তের গল্পে বড় একটা দেখা যায় না, কিন্তু যেখানে তার ব্যবহার করেছেন লেখক, তা ভাবনাকে প্রসারিত করতে, বৃহত্তর কোনো চেতনার সঙ্গে অন্বিত করতে নয়; কখনো এর মধ্যে দিয়ে নিয়তি আরও অলঙ্ঘনীয় রূপ নিয়েছে, আবার কখনো মিথ্যের প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে তাকে ভাঙা হবে বলেই। যেমন, 'বিধবা রতিমঞ্জরী'[২১] গল্পে রতিমঞ্জরীর কাছে বৈধব্য অভিশাপ হয়ে আসে না, আসে আশীর্বাদ হয়ে। অন্যাসক্ত স্বামীর কাছে নিজের যে মূল্য সে কোনোদিন পায়নি বরং সধবার চিহ্নগুলি তাকে প্রতিনিয়ত বিদ্রূপ করেছে, সেই মূল্যই খুঁজে নেওয়ার সুযোগ তার আসে যৌবনে বিধবা হয়ে। আয়নায় নিজের ছায়া দেখে তার মনে হয় কোথাও কোনো কিছুর অভাব ঘটেনি, ভাঁটার চিহ্ন নেই রূপ যৌবনে। কিন্তু প্রতিবিম্ব অন্য কিছু দেখায় যা রতিমঞ্জরী দেখতে পায় না, ধরতে পারে না। দেখায় তার ভবিতব্যকে, নিয়তিকে— "বিধবা হওয়ার পর এই প্রথম তার সর্বাঙ্গের সমগ্র প্রতিবিম্ব একসঙ্গে সে দেখতে পেলে— মুখ, ললাট, হাত—সব—পা পর্যন্ত। তার অঙ্গে, কাজেই তার অঙ্গের এই প্রতিবিম্বে, অয়তি সৌভাগ্যের রক্তচিহ্ন লেশমাত্র কোথাও নাই— যেন নিষ্পল্লব বৃক্ষ — দেহের সমস্ত স্নিগ্ধতা অপহৃত হ'য়ে একটা নির্লজ্জ রিক্ততা নগ্ন হ'য়ে ধূ ধূ করছে..." রতিমঞ্জরী নিজের

প্রতিবিম্বের মধ্যে দেখে অস্পর্শিত সৌন্দর্যকে কিন্তু আবার নতুন করে জীবন শুরু করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে রিক্ত প্রকৃতির মাঝে নিষ্পল্লব গাছের চিত্রকল্পের পরিণতি পায় তার জীবন।

প্রেম-ভালোবাসা-মুগ্ধতার রোমান্টিক ধারণাগুলোকে নিয়ে নির্মমভাবে খেলেছেন জগদীশ গুপ্ত, খেলেছেন সামাজিক সম্পর্কগুলি নিয়েও। তারপর একসময় শিশুর খেলনার মতো সেগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাই তাঁর গল্পে দেখি, পুত্রবতী পত্নী থাকা সত্ত্বেও একজন পুরুষ, শুধুমাত্র শ্বশুরের সম্পত্তি হস্তগত করার লোভে শ্যালিকাকে বিবাহ করে। এমনকি, একটি সুন্দরী বিধবা যুবতীকে কাছে পাওয়ার বাসনায় আর এক পুরুষ বিয়ে করে বসে বিধবার নাবালিকা কন্যাটিকে। অবশ্য শুধুই পুরুষের হৃদয়হীন লালসার শিকার নয় নারী, অন্যরকম ছবি পাওয়া যায় 'রসাভাস'[২২] গল্পে যেখানে তীব্র ব্যঙ্গের অট্টহাসিতে বুদবুদের মতো ফেটে যায় কল্পনার রঙিন বেলুন। বাগ্‌দীদের মেয়ে সূর্যমুখীর নামটাই সেই ব্যঙ্গের প্রথম ধাপ, বঙ্কিমের সতীসাধ্বি নায়িকার নামটি ইচ্ছাকৃত ভাবেই লেখক ব্যবহার করেছেন বলে মনে হয়। এই সূর্যমুখী তার রূপের অহঙ্কারে স্বামীকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি ফিরে আসে এবং প্রৌঢ় ধনী গৌরগোপালের রক্ষিতা হয়ে থাকে। হৃদয়নাথ নামে আর এক ব্যক্তির সঙ্গে যখন পথের ধারে সূর্যমুখীর দেখা হয়, তখন তার রূপকে এক স্বর্গীয় মহিমা দেন লেখক একটি চিত্রকল্পে— "হৃদয়নাথ তাহাকে দেখিল জলদ স্নিগ্ধ অপরাহ্নে . . . সেদিন সূর্যমুখী বৃক্ষের ছায়ালিঙ্গনের মাঝে দাঁড়াইয়া রূপের প্রবাহ দিকচিহ্নহীন সমুদ্রের মতো অনন্তে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিল— রৌদ্রকে মণ্ডিত করিয়াছিল কষিত কাঞ্চনে—

আজও তাই—

আজও সে জলদের ঘন ছায়ালিঙ্গনকে স্নিগ্ধতম সুরঞ্জনী প্রভায় প্রফুল্লিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— রূপ পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া গেছে।" এই অপার্থিব সৌন্দর্যের অধিকারিণীকে দেখে হৃদয় হারায় বিবাহিত হৃদয়নাথ এবং অনেক গোপন কল্পনার পর পূর্বনির্ধারিত দিনে মিলনের উদ্দেশ্যে গিয়ে দেখে, তার স্বপ্নের নারী তীব্র কলহে লিপ্ত এবং উচ্চকণ্ঠের কদর্য গালাগালিতে আশেপাশে লোক জমেছে বিস্তর। হৃদয়নাথকে দেখতে পেয়েও এতটুকু অপ্রস্তুত না হয়ে সে তার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে বলে, চাইলে ওই বাবুকে সে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে, ভালো পয়সা মিলবে। প্রেম-মুগ্ধতা নিয়ে পুরুষের ভণ্ডামির মুখোশ এক টানে খুলে যায় এই ক্লাইম্যাক্সে, সূর্যমুখীর অপার্থিব সৌন্দর্যের চিত্রকল্পটিও ঝড়ে ছিঁড়ে যাওয়া বিজ্ঞাপনের সুন্দরীর বিশালাকৃতি ছবির মতো কুঁকড়ে ঝুলতে থাকে।

জগদীশ গুপ্তের অন্ধকার জগৎকে কিছুটা অন্যভাবে ফিরে পাওয়া যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে এসে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের গল্প সংকলনের ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত এবং উন্নাসিক প্রবন্ধ[২৩] লিখেছিলেন। এতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পর বিংশ শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত আদৌ কোনো আধুনিক সাহিত্যভাষা তৈরি হয়েছে কি? তাঁর মতে, কবিতায় যেমন জীবনানন্দ, কথাসাহিত্যে তেমন একমাত্র ব্যতিক্রম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি তাঁর চারপাশের 'শিল্পচৈতন্যহীন অশিক্ষিত' গদ্যলেখকদের ভিড় ছাপিয়ে মাথা তুলেছেন। উইলিয়াম ব্লেক কিংবা ডস্টয়েভস্কির মতো একটি

যুগ শুরু হওয়ার আগেই তার প্রতিনিধিত্ব করেছেন পুতুল নাচের ইতিকথার মতো অস্তিবাদী উপন্যাস লিখে। সন্দীপনের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা সহমত না হতেই পারি। কিন্তু সেই তর্ক আপাতত পাশে সরিয়ে রেখে যদি মানিকের গল্পের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব, তাঁর প্রথম পর্বের গল্পের আত্মার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক নৈর্ব্যক্তিক বিযুক্তি। তবে তা অস্তিবাদী দর্শন সঞ্জাত কিনা, সে প্রশ্ন আপাতত নিষ্প্রয়োজন। গল্পের চরিত্রগত বিশেষত্বের কারণেই হয়ত বা মানিক চিত্রকল্প নির্মাণে ততটা মনোযোগী নন। ভিখু-পাঁচীর 'প্রাগৈতিহাসিক' জীবন কোন পথে চলে কিংবা ঠাণ্ডা রক্তের বৃহৎ 'সরীসৃপে'র মতো বনমালী কীভাবে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে সেকথা লিখতে গিয়ে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে গল্পের চরিত্রদের অন্বিত করার প্রয়োজন হয় না বরং পাঠকের সঙ্গে থাকুক কিছুটা শিউরে ওঠা দূরত্ব, এমনটাই হয়তো লেখক চান। তবু কখনো কখনো বিরল কোনো মুহূর্তে অন্ধকার আকাশে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠা ছবি চিনিয়ে দেয় লেখকের প্রতিভাকে। যেমন দেখি 'টিকটিকি'[২৪] গল্পের শুরুতে— "দোতলা বাড়ি। শহরের যে অঞ্চল বেজায় শহুরে বলে খ্যাত সেইখানে। তিন দিকে গাদা করা বাড়ির চাপ, একদিকে রাজপথের চটুল ফাজলামি, আবেষ্টনীকে লক্ষ্য করলে সন্দেহ হয়, সমস্তটাই বুঝি হাই মায়োপিয়ার লীলা। তাছাড়া, এমন চেহারা বাড়িটার যে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা অসরূর্ণ রহস্যের মতো কুৎসিত। সস্তা মেয়েমানুষ যেন পথিকের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, আমি ভীরু ও সরলা, খাঁটি গাঁয়ের মেয়ে, তবে অসতী। বেআবরু সমতল পিঠে পুরোনো বাদামী রঙের আবরণটা চোখেই পড়তে চায় না, প্রাচীনতার ছাপ এত স্পষ্ট।" এই বাড়ির দেওয়ালেই টিকটিকিরা ঘুরে বেড়ায় জ্যোতিষার্ণবেব মনের অবদমিত ইচ্ছের মতো। তিন সন্তানের পিতা প্রৌঢ়, বিপত্নীক জ্যোতিষার্ণব যখন যুবতী রেবতীকে বিবাহ করে আনেন তখন নিজের জ্যোতিষবিদ্যার চাইতেও তিনি বেশি নির্ভর করতে শুরু করেন দেওয়ালে ভ্রাম্যমাণ টিকটিকির ডাকের ওপর, 'সস্তা মেয়েমানুষের বেআবরু' পিঠের মতো দেওয়ালে ঘুরে বেড়ানো টিকটিকিরা যেন মানুষের মনের পাহারাদার, জানে অনেক গোপন সত্য।

যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা গল্পগুলিতে মানিকের সেই নির্মম নির্লিপ্তি অনেকটাই অপসৃত। বরং রাষ্ট্র এবং সমাজের বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষোভের ধিকিধিকি আগুন আর অসহায় মানুষগুলির জন্য সজল সহানুভূতি সঞ্চারিত গল্পের শিকড়ে, শিরায়। চল্লিশের দশকের বস্ত্র মহামারির প্রেক্ষাপটে লেখা গল্প 'দুঃশাসনীয়'[২৫]। ক্ষুধার একটা সর্বজনবোধ্য, তীব্র ভাষা আছে। কিন্তু বস্ত্র সঙ্কটের বিপন্নতা যে শুধুই নারীর, বিশেষত সেই অভাব যখন অন্যরকমের ক্ষুধাকেও জাগিয়ে তোলে। এই গল্পে হাতিপুর গ্রামের মেয়েরা কাপড়ের অভাবে পালাতে পালাতে, লুকোতে লুকোতে প্রায় যেন অবয়বহীন ছায়ায় রূপান্তরিত। দিনের আলো নিভে গেলে পরেই তারা প্রেতের মতো জেগে ওঠে, চলে ফিরে বেড়ায়। তাদের সেই অনৈসর্গিক অস্তিত্বকে মহাভারতীয় অনুষঙ্গের সঙ্গে জুড়ে মানিক নির্মাণ করেন এক অসামান্য চিত্রকল্প— "কোন ছায়ার গায়ে লটকানো থাকে একফালি ন্যাকড়া, কোন ছায়ার কোমরে জড়ানো থাকে গাছের পাতার সেলাই করা ঘগরা, কোনো ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, কুরুসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন, অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো।" গল্পের শেষে রাবেয়ার আত্মহত্যার ঘটনার সূত্রপাতও এই প্রারম্ভিক চিত্রকল্পে।

'কল্লোল যুগ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিংশ শতকের বিশ-তিরিশের দশক জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড়সড় মাইলফলক। কিন্তু কোনো প্রাচীন সৌধকে দূর থেকে দেখে নিটোল, মসৃণ মনে হলেও কাছে গেলে যেমন চোখে পড়ে দেওয়ালের চিড়, ফাটল, তেমন 'কল্লোল গোষ্ঠী' নামে পরিচিত লেখকেরাও যে মিলে মিশে এক সত্তা নয় তা তাদের লেখার মধ্যে সামান্য ঢুকলেই বোঝা যায়। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে মনীশ ঘটকের কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের লেখার পার্থক্য ততটাই যতটা সমকালের দুজন সচেতন লেখকের মধ্যে হয়ে থাকে। বিংশ শতকে পৌঁছে যে নতুন আধুনিকতার দাবি উঠেছিল, তাকে তাঁরা নিজের নিজের মতো করে বুঝে নেওয়ার এবং রূপদান করার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং এঁদের সাহিত্যের আঙ্গিক বা নির্মাণ কৌশলও গোষ্ঠীনিরপেক্ষ, ব্যক্তিনির্ভর। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুই গদ্যলেখক যেমন, শৈলজানন্দ বা অচিন্ত্যকুমার আবার কেউবা কবি এবং গদ্যকার দুইই যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। একজন কবি যখন গদ্য লেখেন তখন তাঁর জগৎ নিছক গদ্যময় হয়ে থাকে না, কবিতা সতত সঞ্চরমান মেঘের মতো শ্যামল ছায়া ফেলে কঠিন, রূঢ় বাস্তবের মাটির ওপর। একই অনুষঙ্গ ফিরে ফিরে আসে গল্পে, কবিতায়। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র। এমনটা বলা হয়ে থাকে, তাঁর গল্প কবিতার তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক। আর এই অন্তর্গত যাতায়াতের সূত্র, চিত্রকল্প। যার একটি অবধারিতভাবে ঘুরে ফিরে আসা কলকাতা শহর। কিন্তু সেই শহর শুধুই ধুলো, ধোঁয়া, যানজট, ধাক্কাধাক্কি আর ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ের শহর নয়। বরং লেখক কল্পনা করেন, বিচিত্র নাগরিক ক্যাকফনির মাঝে হয়তো কোথাও আছে শান্ত, নিস্তরঙ্গ একটি দীঘি, হঠাৎ কখনো পথ হারিয়ে সেখানে পৌঁছে যাওয়া যায়।—

রাস্তা পিচের, বাসটা নতুন
ঝাঁকানি নেই।
ভিড় কি ছিল?
ফোস্কা-পড়া তাত,
হল্‌কা-ওঠা আঙরা-রাঙা ডাঙা
চোখ ঝলসায়, মন ঝিম ঝিম
কোথায় যে গেছলাম।

শ্যাওলা ঘাটের কত দীঘির
শীতল কালো জল
কত নদীর হঠাৎ অবাক্ নীল,
ঘন বনের সবুজ আঁধার
লেপে লেপেও তবু
জ্বলার আরাম কই!

দারুণ দিনের সেই যাওয়া যে কাকে খুঁজতে যাওয়া
নেইকো মনে, জ্বলে শুধু আজো খোঁজ না পাওয়া।[২৬]

ঠিক এইভাবেই, প্রতিদিনের জীবনসংগ্রাম আর আত্মবিস্মৃত ছুটে চলার মধ্যে হঠাৎই কোনো নাগরিক মানুষ 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'[২৭] করে ফেলে, যেখানে শ্যাওলাজমা দিঘির ভাঙা ঘাট পেরিয়ে প্রায় ধ্বংসস্তূপ বাড়িটিতে ঘুমপুরীর রাজকন্যার মতো তার রাজপুত্রের পথ চেয়ে থাকে যামিনী। অচেনা শহুরে যুবকটি প্রায় ঘোরের বসে যামিনীর মৃত্যুপথযাত্রী অন্ধ মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, সে-ই হারিয়ে যাওয়া নিরঞ্জন এবং সে আবার আসবে, যামিনীকে নিয়ে যাবে। এই শপথ সমস্ত অপরিচয়ের দূরত্বকে ছাপিয়ে নিশ্চিত প্রত্যয়ের মতো জেগে থাকে যুবকটির মনে এবং সে বিশ্বাস করতে চায় অন্য একজনের অপমান, অবহেলা ভুলিয়ে দিতে সত্যিই সে ফিরে আসবে। কিন্তু রূপকথারা তো সত্যি হয় না বাস্তবে, তাই তেলেনাপোতায় আর ফিরে যাওয়া হয়না, ঘুমপুরীর রাজকন্যা তলিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। আসলে তেলেনাপোতা তো অন্য কোথাও নেই, আছে কঠিন, নির্মম নাগরিক মানুষের মনের গভীরে লুকোনো হ্রদের মতো যেখানে সরল কিছু বিশ্বাস, কিছু স্বপ্ন মাছের মতো খেলা করে। সেই ইঙ্গিত লেখকই দিয়ে দেন গল্পের শুরুর চিত্রকল্পে— ". . . কাজে কর্মে মানুষের ভিড়ে হাঁফিয়ে ওঠার পর যদি হঠাৎ দু-দিনের জন্য ছুটি পাওয়া যায়— আর যদি কেউ এসে ফুসলানি দেয় যে কোনো এক আশ্চর্য সরোবরে— পৃথিবীর সবচেয়ে সরলতম মাছেরা এখনো তাদের জল-জীবনের প্রথম বঁড়শিতে হৃদয়বিদ্ধ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে, আর জীবনে কখনো কয়েকটা পুঁটি ছাড়া অন্য কিছু জল থেকে টেনে তোলার সৌভাগ্য যদি আপনার না হয়ে থাকে, তা হ'লে হঠাৎ একদিন তেলেনাপোতা আপনিও আবিষ্কার করতে পারেন।"

আপাতদৃষ্টিতে গ্রাম্য বালক রতনের 'মহানগর'[২৮] আবিষ্কারকে মনে হতে পারে তেলেনাপোতা আবিষ্কারের বিপ্রতীপ। কারণ রতন জীবনে প্রথম মহানগরে আসে তার হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজতে, যে দিদি একাধারে তার মা, বন্ধু, যাকে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম থেকে কারা যেন তুলে নিয়ে গিয়েছিল আর তারপর পুলিশ তার খোঁজ পেলেও রতন দেখে, দিদি আর ফিরে আসেনা এবং তার নাম, স্মৃতি সবকিছুই নিরুচ্চারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বন্ধ সিন্দুকের তলায়। যদিও 'বড়দের' জগতের অনেককিছুই ঝাপসা রতনের কাছে, অনেক 'কেন'র উত্তরই তার জানা নেই, তবু বালক হৃদয়ের অদম্য উৎসাহে সে সংকল্প করে দিদিকে ফিরিয়ে আনবে। তারা বাবা এবং অন্যান্য জেলেদের সঙ্গে নৌকায় যেদিন সে কলকাতার ঘাটে পৌঁছোয়, সেদিন ভোরের প্রথম আলোয় মহানগরকে তার মনে হয় গভীর অরণ্য, তাতে ভয়ঙ্কর জন্তুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে— "নীহারিকার মতো আকারহীন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়াটে তরলতা থেকে রতনের চোখের ওপরেই কে যেন এইমাত্র নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে তুলছে। আকাশের গায়ে কালো খানিকটা তুলির পোঁচ দেখতে-দেখতে হ'য়ে উঠল প্রকাণ্ড একটা জাহাজ, তার জটিল মাস্তুলগুলি উঠেছে ছোটোখাটো অরণ্যের মতো মেঘলা আকাশে, তার নোঙরের শেকল নেমেছে অতিকায় অজগরের মতো জলের ভেতর। রতনদের নৌকা সে দানবের ভ্রূকুটির তলা দিয়ে ভয়ে-ভয়ে পার হয়ে যায় ছোটো শোলার খেলনার মতো। জলের আরেক ধারে বিছানো ছিল খানিকটা তরল রঙের কুয়াশা। সে কুয়াশা জমাট বেঁধে হয়ে গেল অনেকগুলো গাধাবোটের জটলা— একটি জেটির চারধারে তারা ভিড় করে আছে। দূর থেকে মনে হয়, ওরা যেন কোনো বিশাল জলচরের শাবক— মায়ের

কোল ঘেঁষে তার পাকিয়ে আছে ঘুমিয়ে। নদীর ওপরকার পর্দা আরো গেল স'রে। কলকারখানার বিশাল সব দেহ উঠল জেগে নদীর দু-পারে। জলের ওপর তাদের লৌহবাহু তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধানো পাড় থেকে বড় বড় ক্রেন উঠেছে গলা বাড়িয়ে; দুই তীরে সদাগরী জাহাজের আশেপাশে জেলে-ডিঙি আর খেয়া-নৌকা, স্টীমার আর লঞ্চ ভিড় করে আছে। এই মহানগর! ভয়ে বিস্ময়ে ব্যাকুলতায় অভিভূত হ'য়ে রতন প্রথম তার রূপ দেখলে।" লোহালক্কড় আর কংক্রিটের জঙ্গলের এই চিত্রকল্প এবং রতনের হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজতে আসা আবছা ভাবে আবারও জাগিয়ে তোলে রূপকথার অনুষঙ্গ, যেখানে দুখিনী, পরিত্যক্ত মা দুয়োরানিকে রাজপুত্র সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সেই রূপকথার রাস্তাটাই যেন রতনকে পোনাঘাট থেকে পৌঁছে দেয় উল্টোডাঙ্গার নিষিদ্ধপল্লীতে তার দিদি চপলার কাছে। কিন্তু দুয়োরানিরা ফিরতে পারলেও চপলারা পারে না, আর এখানেই রূপকথাটা ভাঙে। ভাঙা হবে বলেই তো তাকে গড়েছিলেন লেখক। ভৌগোলিক দূরত্ব বা রাস্তার গোলকধাঁধা নয়, তেলেনাপোতার যামিনী বা উল্টোডাঙ্গার চপলারা হারিয়ে যায় হৃদয়হীন নাগরিক বিস্মৃতির কারণে। দুটি গল্পই তাই শেষ হয় সমমাত্রিক দুটি চিত্রকল্পে— "একবার ক্ষণিকের জন্যে আবিষ্কৃত হ'য়ে তেলেনাপোতা আবার চিরন্তন রাত্রির অতলতায় নিমগ্ন হয়ে যাবে" এবং "মহানগরের ওপর সন্ধ্যা নামে বিস্মৃতির মতো গাঢ়।"

বুদ্ধদেব বসু অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অতিমানবিক জীবন অবলম্বনে 'একটি জীবন' লিখেছেন, মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি সদ্য তরুণকে তার প্রিয়জনদের আদরের দাবি কিভাবে নিংড়ে নিঃশেষিত করে ফেলে তার বাস্তব, প্রায় শ্বাসরোধকর ছবি এঁকেছেন 'মা, বোন, ভাই' গল্পে কিন্তু একথা অনস্বীকার্য তিনি, তাঁর নিজেরই গল্পের ('অনুদ্ধারণীয়') ভাষায় 'অনুদ্ধারণীয় রোমান্টিক'। তাঁর *মৌলিনাথ* উপন্যাসের মৌলিনাথ থেকে শুরু করে *মহাভারতের কথার* যুধিষ্ঠির, অর্থাৎ কল্পিত চরিত্র থেকে মহাকাব্যের চরিত্রের পুনর্নির্মাণ, সর্বত্রই এক তীব্র রোমান্টিক আত্মমগ্নতা আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাঁর বেশ কিছু গল্পে দেখা যায় গভীর রোমান্টিক সংবেদনার তার টানটান করে বাঁধা যা স্পর্শ করলেই বেজে ওঠে এবং বাজে কবিতার সুরে। 'কঙ্কাবতী'[২৯] কবিতায় দেখি প্রেমের এক সর্বব্যাপী উজ্জাপন, যা সত্তাকে ছাপিয়ে আলোর মতো উৎসারিত হয়, ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে অজস্র চিত্রকল্পে—

তোমার নামের শব্দ আমার কানে আর প্রাণে গানের মতো—
মর্মের মাঝে মর্মরি বাজে 'কঙ্কা! কঙ্কা! কঙ্কাবতী!'
(কঙ্কাবতী গো)
দূর-সিন্ধুর তরঙ্গ-রোল অমাবস্যায় অনবরত
(অন্ধকারের অন্তর-ভরা ছন্দ-শিহর স্পন্দমান)
সুপ্তির 'পরে স্বপ্নের ঘোরে ফেটে বেজে ওঠে গানের মতো।
অন্ধকারের অন্তর থেকে তরঙ্গ-রোল ইতস্তত
কেঁপে ফুটে ওঠে, ফেটে বেজে যায়, ঢেউয়ের মুখের ফেনারই মতো
(কঙ্কাবতী গো). . . .

বিমূর্ত অনুভূতি শুধুমাত্র দৃশ্যরূপ পায় না, তা হয়ে ওঠে ধ্বনিময়, স্পর্শযোগ্য, কেবল কবিতায় নয়, গল্পেও। অতি সাধারণ ছাপোষা কেরানি প্রতাপ এক সন্ধ্যায় নিউমার্কেট থেকে সাধ্যাতীত

দাম দিয়ে কিনে ফেলে 'একটি লাল গোলাপ'[৩০], উপলক্ষ মায়াবৌদির জন্মদিন। প্রতাপ যে জগতের বাসিন্দা সেই তুলনায় সমী-দা, মায়াবৌদিদের অবস্থান হওয়া উচিত সুদূর নক্ষত্রলোকে। প্রায় দৈববশে সে কোনো একদিন পৌঁছে যায় সেই আলকোজ্জ্বল পৃথিবীতে, তারপর আর ফিরতে পারে না। তার রংচটা জীবন, সংসারের হাঁ-মুখ সবকিছু মিথ্যে মনে হয়, শুধু আলোর নেশায় উদ্‌ভ্রান্ত পতঙ্গের মতো বারবার ছুটে যায় সমী-দার ঝক্‌ঝকে ড্রইংরুমে। ভদ্রতাকে আন্তরিক আহ্বান, উপেক্ষাকে এটিকেট বলে বিশ্বাস করে বা করতে চায়। এই আকর্ষণের আরও গভীর একটি কারণ যা সে নিজের কাছেই স্বীকার করতে চায় না অথচ যা গোধূলির মেঘভাঙা আলোর মতোই স্বয়ং প্রকাশ, সে হল মায়াবৌদির বোন ছায়া। ছায়াকে দেখলে একটি সবুজ পাতায় ভরা গাছের মতো মনে হয় তার এবং গোলাপটি সে মনে মনে ছায়াকেই দিতে চায়। কিন্তু নিমন্ত্রণগৃহের ভিড়ের মধ্যে পৌঁছে উৎকণ্ঠা এবং সঙ্কোচে ফুলটি সে ফেলে দেয়। তারপর ঘটনাচক্রে সেই ফুল ছায়ার হাতে এসে পড়লে অজ্ঞাতপরিচয়ের দানটি যখন সে সযত্নে নিজের চুলে পরে নেয়, তখন আলোকবৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয় প্রতাপ। সেই মুগ্ধতাকে নিজের হৃৎপিণ্ডের মতো দুহাতে আগলে সে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করে যায়, গোলাপটি যেন সেই মুহূর্তে নতুন করে ফুটে ওঠে এবং অতি সাধারণ এক যুবক তার দিনগত পাপক্ষয়ের গভীরে এই গোপন এবং তীব্র অনুভূতিকে যে বাঁচিয়ে রাখবে আজীবন, তা লেখক বুঝিয়ে দেন একটি চিত্রকল্পে— "ছায়া স'রে দাঁড়ালো এবার, আবার ঝিরিঝিরি হাওয়া দিলো পাতা ভরা গাছে, সে-গাছে ফুল ফুটলো এইমাত্র, লাল ফুল, লাল গোলাপ আলো ক'রে আছে, আলো হ'য়ে আছে, কালো চুল হ'লো, কালো হ'লো আলো, সারা দিনের, সারা জীবনের, হাজার জীবনের সকল কালো আলো হ'য়ে গেলো একটি মুহূর্তে, একটি লাল গোলাপে। ... শীতে না, শীতের হাওয়ায় না, সে কাঁপছে পাতা ভরা গাছের ঝিরিঝিরি হাওয়ায়, যে গাছে ফুল ফুটলো এইমাত্র, লাল ফুল, তার ফুল, তার রক্ত-রাঙা গোলাপ, তার রক্ত-ভরা হৃৎপিণ্ড।"

বুদ্ধদেবের গল্পে যখনই প্রেম ছাড়ায় রক্তমাংসের সীমানা, তখনই তা রূপ নেয় চিত্রকল্পের। কিংবা এমনও হতে পারে চিত্রকল্পই মুহূর্তের ভঙ্গুর অনুভূতিকে দেয় চিরন্তনতা। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে সবচাইতে বেশি স্মৃতিসঞ্চারী হল ঘ্রাণ। একটি গন্ধের অনুষঙ্গ মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারে দেশকালের সীমানা, চেনা গন্ধ নিমেষে পার করে অপরিচয়ের সমুদ্র। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ '. . .বহুযুগের লুপ্তাবশিষ্ট মাখাঘসা ও আতরের মৃদু গন্ধ' শতশত বছরের ওপার থেকে ভেসে এসে শিহরিত করে গল্পের কথককে। এমনই স্মৃতি-উজ্জীবক গন্ধের অনুষঙ্গবাহী চিত্রকল্প পাই বুদ্ধদেবের 'তুলসী-গন্ধ'[৩১] গল্পে। কমলা তার স্বামীর চাকরির বদলি সূত্রে ঢাকা শহরে আসে। এই শহরে সে বড় হয়েছে, এই শহর জানে তার প্রথম সব কিছু। স্বামী মিহির কাজে বেরিয়ে গেলে কমলা একাই বেরিয়ে পড়ে দুপুরবেলা। যেন এলোমেলো ঘুরতে ঘুরতে সে পৌঁছে যায় নিঃঝুম এক পাড়ার একটি পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে। ইটখসা পাঁচিল পেরিয়ে আবর্জনায় ভরা উঠোনে তুলসীমঞ্চের সামনে যখন সে এসে পৌঁছোয় তখন হারিয়ে যাওয়া একটি গন্ধ যেন তাকে জাগিয়ে তোলে বিস্মৃতির অতল থেকে।— "সে জায়গাটা রীতিমতো তুলসীর জঙ্গল হয়ে গেছে, পেকে লাল হয়ে এসেছে মঞ্জরীগুলো। . . . নিচু হয়ে একটা তুলসীর পাতা ছিঁড়ে সে তার আঙুলের মধ্যে চটকালো, গন্ধ ভেসে এলো তার নাকে।

তার সামনের হাওয়াটাকে সে শুঁকলো কয়েকবার, তুলসীর গন্ধ লেগে রইল তার ঘ্রাণে। আর এই, এ-ই হচ্ছে সব, যা সে এখান থেকে নিয়ে যাবে; এরই জন্য সে এসেছিল।" ধূপের ধোঁয়ার মতো একটা আবছা কাহিনির আদল পাওয়া যায়, কোনো এক তরুণের মুগ্ধতা, যে একসময় থাকতো এই পরিত্যক্ত বাড়িটিতে, তারপর হয়তো মেয়েটিই একদিন ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আজ ফিরে এসে দেখছে কেউ নেই। এই কাহিনিকে খুব একটা স্পষ্ট করা হয়নি গল্পে, শুধু সেই আবছা পটভূমি থেকে উঠে আসা তুলসীগন্ধ পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে কমলার সমগ্র সত্তাকে, তার বর্তমানকে ছিঁড়ে সুখী, তৃপ্ত দাম্পত্যের ঘোর ভেঙে তাকে জাগিয়ে তুলেছে অতীতে, ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো দুঃখ।

নিম্নবর্গীয় জীবনকে সাহিত্যে তুলে আনার যে অন্যতম লক্ষ ছিল কল্লোলীয়দের, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তার একজন দক্ষ ও সফল শিল্পী। 'কয়লাকুঠি' গল্পে বীরভূমের কয়লা শ্রমিকদের জীবন থেকে শুরু করে 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' গল্পে কলকাতার অন্ধকূপের মতো মেসবাড়ির বাসিন্দাদের রোজনামচায়— দারিদ্র এবং অবক্ষয়ের ছবি আজও আমাদের চমকে দেয়। শৈলজানন্দ জানতেন, ডকুমেন্টেশনকে কীভাবে শিল্প করে তুলতে হয়। আবার এও জানতেন, অভ্যস্ত পরিসর ছেড়ে মাঝে মাঝে বেরিয়ে না এলে পুনরুক্তি এড়ানো অসম্ভব। তাই হয়তো 'বদলি মঞ্জুর'[৩২]-এ খর বাস্তবতার মুখের ওপর ঘনিয়ে আসে মেঘলা বিষণ্ণতা, নৈর্ব্যক্তিক বিবৃতি পথ ছেড়ে দেয় নিসর্গ, চিত্রকল্পকে। বাংলা কিংবা বিহার সীমান্তের একটি ব্রাঞ্চ স্টেশনের স্টেশন মাস্টার হরিপদর স্ত্রী বীণাপাণি নিঃসঙ্গতাকে সঙ্গী করে বাঁচে। তার অতি সাধারণ এবং তৃপ্ত স্বামী বীণার মনের খোঁজ রাখে না। বীণাপাণি একান্ত ভাবে কামনা করে হরিপদর বদলি মঞ্জুর হোক। আসলে সে এই একঘেয়ে বেঁচে থাকা থেকে মুক্তি চায়। তার বৈচিত্র্যহীন জীবনে আলোড়ন ওঠে একবারই যখন হরিপদর মামাতো ভাই সুকুমার গন্তব্যে যাওয়ার পথে দুদিন তাদের বাড়িতে থেকে যায়। সুকুমারের চোখের আয়নায় নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে বীণা। আবার আসবে বলে কথা দিয়ে গেলেও আসে না আর সুকুমার, হরিপদর হাতে পাঠায় তার উপহার, রক্তের মতো লাল এক শিশি আলতা। এর কিছুদিন পরে বড় জংশন স্টেশনে বদলির চিঠি আসে হরিপদর কিন্তু ততদিনে বীণার আরও অনেক দূরে বদলি মঞ্জুর হয়ে গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার বাক্সটা খোলে হরিপদ, যেন তার বুকের সিন্দুকটা খোলে জীবনে প্রথম বার। আর তারপর এক আশ্চর্য ছবি বীণাপাণির রক্তাক্ত হৃদয়ের— "বীণার বাক্স। তাহারই নিজের হাতে সাজানো জিনিস। কিন্তু এ কি! থাকে থাকে সাজানো জামাকাপড় সব যেন লাল! মনে হইল—সব যেন রক্তে ছোপানো। . . . কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কাপড়-জামাগুলি হরিপদ নামাইতে লাগিল। দেখিল, বাক্সের এককোণে সযত্নরক্ষিত সুকুমারের দেওয়া সেই আলতার শিশিটি। ভাঙিয়া কোন সময় সমস্ত আলতা গড়াইয়া পড়িয়াছে।" এই বাক্সের মধ্যে সুকুমারকে লেখা বীণার অসম্পূর্ণ কয়েকটি চিঠিও পায় হরিপদ। মৃতা স্ত্রীকে নতুন ভাবে আবিষ্কার কি বদলে দেবে হরিপদকে! সম্ভবত নয়, কারণ সমাপ্তির সংক্ষিপ্ত একটি চিত্রকল্প তেমনই ইঙ্গিত দেয়— ". . . পাশের বাড়ির সাদা রঙের একটা পোষা বিড়াল বীণার সেই অস্থির পিণ্ডটা লইয়া ঘরের মেঝের উপর পা দিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলিতেছে।" বোঝা যায়, নিজের অভ্যস্ত পরিসর থেকে বেরিয়ে গিয়ে গল্প লিখতে শৈলজানন্দকে অন্যের জুতোয় পা গলাতে হয়নি।

বহুভাষাবিদ্ এবং দেশবিদেশের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঝুলিতে যাঁর, সেই সৈয়দ মুজতবা আলী মননে এবং মেজাজে তাঁর সমসাময়িক কল্লোলের লেখকদের চাইতে অনেকটাই আলাদা। তাঁর নিজস্ব কৌতুকবোধ, যাকে বলে 'wit', প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসুদের উত্তরাধিকার স্বীকার করেও স্বতন্ত্র। মুজতবা আলীর গল্প যেন এক আশ্চর্য ক্যালাইডোস্কোপ যা মুহূর্তের পরিসরে ফুটিয়ে তোলে বহু বিচিত্র চরিত্রদের তাদের পটভূমি সমেত। অনেক সময়েই সেগুলি দক্ষ তুলির টানে আঁকা ছবি হয়ে ওঠে। এমন দুটি ছবিকে পাশাপাশি রাখলে মুজতবা আলীর পরিসরের বিস্তৃতি হয়তো কিছুটা বোঝানো যাবে। একজন 'পাদটীকা'[৩৩] গল্পের পণ্ডিতমশাই আর অন্যজন 'কর্নেল'[৩৪] গল্পের হের ওবের্স্ট। আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত কিন্তু লেখকের সংবেদী উপস্থাপনায় ধরা পড়ে গভীর কোনো একাত্মতা। ইংরেজ আমলের স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ক্রমশ গুরুত্ব হারালে পূর্বতন টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতেরা সরকারি স্কুলগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষকতা করে কোনোমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখেন। এমনই একজন তর্কালঙ্কার বা কাব্যবিশারদ পণ্ডিতমশাইয়ের গল্প 'পাদটীকা'। আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিধ্বস্ত জার্মানিতে এককালের বনেদী বড়লোক, বর্তমানে কপর্দকশূন্য পরিবারের কর্তা 'কর্নেল' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। দুজনেই বিলীয়মান ঐতিহ্যের প্রতিভূ, বদলে যাওয়া বর্তমানে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই তাঁদের দুজনেরই। কিন্তু পণ্ডিতমশাই যেখানে নিজেকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন, লাটসাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে বৃদ্ধ ভাঁড়ের মতো তাঁকে তোয়াজ করেন আর ছাত্রদের সামনে গোটা ব্রাহ্মণ পরিবারকে সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের মূল্যের সঙ্গে তুলনা করে আত্মগ্লানি মেখে নেন সর্বাঙ্গে, সেখানে কর্নেল হের ওবের্স্ট নিজ কন্যাকে ত্যাগ করেন সে ফরাসী বিয়ে করেছে বলে এবং চাকরি ছেড়ে, পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত যাবতীয় সামগ্রী বেচে দিয়ে শুধুমাত্র বর্ণবিশুদ্ধতা এবং আভিজাত্যকে সম্বল করে একটু একটু করে নিমজ্জিত হন স্বখাত সলিলে। এই মানুষদুটির চরিত্র এবং জীবনকে বাদামের খোলায় পুরে ফেলেন মুজতবা আলী কথায় ছবি এঁকে— "তাঁর (পণ্ডিতমশাই) যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তার জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া টিকিতে দোলা লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব।" ('পাদটীকা') এবং "এ যেন নর্মদা-পারের সন্ন্যাসী বিলিতি কাপড় পরে পদ্মাসনে না বসে চেয়ারে বসেছেন। দেহের উত্তমার্ধ কিন্তু যোগাসনে— শিরদাঁড়া খাঁড়া, চেয়ারে হেলান দেননি।

শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, শুষ্ক মুখ, আর সেই শুঁকনো মুখ আরো পাংশু করে দিয়েছে দু'খানি বেগুনি ঠোঁট। কপাল থেকে নাক নেমে এসেছে সোজা, চশমার ব্রিজের জায়গায় এতটুকু খাঁজ খায়নি আর গালের হাড় বেরিয়ে এসে চোখের কোটর দুটোকে করে দিয়েছে গভীর গুহার মত। কিন্তু কী চোখ! আমার মনে হল উঁচু পাহাড় থেকে তাকিয়ে দেখছি নিচে, চতুর্দিকে পাথরে ঘেরা নীল সরোবর। কী গভীর, কী তরল। সে চোখে যেন এতটুকু লুকোনো জিনিস নেই।" ('কর্নেল') একজন আত্মবিস্মৃত অন্যজন আত্মসমাহিত, লেখক একজনকে দেখেছেন সহানুভূতির দৃষ্টিতে অন্যজনকে সম্ভ্রমের। কিন্তু এই বিরল প্রজাতির মানুষগুলির আত্মঘাতী পরিণতির ইঙ্গিত, যে মৃত্যু কখনো শারীরিক কখনো মানসিক, তাঁদের পরিচয়ের সূচনাতেই ধরা থাকে।

বয়সে কিছুটা বড় জ্যোতির্ময়ী দেবী বহুদিন পর্যন্ত সাধারণ পাঠকের পরিধির বাইরে ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে তিনি বেশ কিছু সাহিত্য পুরস্কার পেলেও মূল ধারার বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর নাম বড় একটা উঠে আসেনি, যতটুকু এসেছে তা মহিলা লেখক হিসেবে। কিন্তু মহিলা বলে আসন সংরক্ষণের প্রয়োজন যে নেই তা তাঁর কয়েকটি গল্প-উপন্যাসের পাতা ওল্টালেই বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, পড়তে পড়তে মনে হয় কোনো গোপন রত্নভাণ্ডার খুলে গেছে, এত বৈচিত্র্য খুব কম বাঙালি লেখকের রচনাতেই দেখা যায়। পিতার চাকরিসূত্রে রাজস্থানে কেটেছে শৈশব, কৈশোর, মধ্য যৌবনে স্বামীকে হারিয়ে আবার ফিরে যান সেখানেই। এই অভিজ্ঞতার বীজধান তাঁর লেখনিতে সোনা ফলিয়েছে। রাজপুতানার রাজঅন্তঃপুর থেকে দেশভাগ পরবর্তী বাংলা ও পাঞ্জাবের মানুষের জীবনকে যেভাবে তুলে এনেছেন তিনি, তাতে ইতিহাসের সত্য এবং সাহিত্যের স্বাদ, কোনোটিরই ন্যূনতা নেই। অথচ এই লেখিকাই যখন আশাপূর্ণা দেবীর সাম্রাজ্যে পা রাখেন, লেখেন সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সাধ, স্বপ্ন, বঞ্চনা, হতাশার কাহিনি তখন অবিরত চেনামুখগুলির উপস্থাপনার গুণে নতুন হয়ে ওঠা বিস্মিত করে পাঠককে। কিছুটা উদাসীন তাঁর লিখনভঙ্গি, মেয়েলি তাকে বলা যাবে না আবার পুরুষালি হয়ে ওঠার অযথা প্রচেষ্টাও নেই। বিশ্লেষণের বদলে অনেক সময়েই রেখে যান কিছু খোলা সুতো, কিছু চিত্রকল্প, গল্প শেষ হওয়ার পরও ছবি আঁকা চলতে থাকে, পাঠক নিজের মনের রং তাতে মিলিয়ে নিতে পারেন। এমনই একটি গল্প 'তেপান্তরের মাঠ'[৩৫]। বিধবা মায়ের একমাত্র কন্যা শৈলর ভাগ্য বঙ্গদেশের আরও অনেক মেয়ের চাইতে বড় একটা আলাদা নয় যাকে পুরুষ অভিভাবকের অভাবে জ্যাঠতুতো দাদাদের পরিবারে আশ্রয় নিতে এবং দুবেলা হেঁসেল ঠেলে সেই আশ্রয়ের মূল্য চোকাতে হয়। তার বিয়ের চেষ্টা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হয়ে যায় কারণ, 'আর পাঁচটা ব্যবহার্য জিনিসের মত স্বামী সংগ্রহ করতেও টাকা লাগে।' ভোর থেকে মধ্যরাত অবধি তার কাটে সংসারের নানান কাজে যার জন্য উচ্চারিত বা অনুচ্চারিত কোনো স্বীকৃতিই সে পায় না। সে আড়াল থেকে শোনে, সংসারের কর্ত্রী, তার মাতৃসমা বিধবা জ্যাঠতুতো দিদি তাকে 'ও, ওই একজন' বলে উল্লেখ করেন, তার তৈরি খাবার আমন্ত্রিত অতিথিদের কারও প্রশংসা পেলে বাড়ির মেয়ে বউরা অবলীলায় সেই কৃতিত্ব আত্মসাৎ করে নেয়। মাঝে মাঝে কনে দেখানোর প্রহসনও চলে, বিপত্নীক কোনো প্রৌঢ় এসে তাকে দেখে যান কিন্তু পছন্দ করেন না। শৈল কিন্তু এ নিয়ে বড় একটা ভাবে না, তীব্র কোনো ক্ষোভ বা দুঃখও জাগে না তার মনে। সেখানে কেবল জেগে থাকে দিক্‌চিহ্নহীন, ঊষর এক তেপান্তরের মাঠ— "শৈলর নীল আকাশটুকু ঝাপসা হয়ে গেল; চোখের সামনে জেগে ওঠে প্রকাণ্ড দিক-দিগন্তহীন প্রান্তর—বাংলাদেশের মাঠের মতো সবুজ নয়, শ্যামল নয়— এ মাঠ শৈল কখনও দেখেনি, এই যেন সেই তেপান্তরের মাঠ। অনেক দূরে এক দিকে পাহাড়ের সারি, বেঁটে বেঁটে বাবলাগাছ এখানে ওখানে আর শুধু পুরীর বালির মত ধূ-ধূ করা বালি। যেদিকে তাকায়, সুমুখে পাহাড়ের ওপারে সাদা কি দেখা যায়— যেন বাড়ির মতন, সমতলে পেছনে দূরে মেটে ঘর। কোন্ দিকে যাবে, শৈল ভাবে। কিসের জন্য তা ও জানে না, শুধু ভাবে, আগে ঐ মন্দিরের দিকে যাবে— না কোথায় যাবে, কোন্ পথে এল তাও বোঝা যায় না। পাহাড়ে প্রান্তরে আকাশে আর অমিল নেই— সমস্ত শূন্য ভরে তারা ওরই পানে চেয়ে আছে শুধু।" লেখিকা যখন তাঁর নিজের

অভিজ্ঞতায় দেখা রাজস্থানের মরুপ্রান্তরের ছবিটি বাংলার কোনো শহর বা মফঃস্বলের অন্ধগলির মেয়ে শৈলকে দেন তখনই সেটি ভৌগোলিক পরিচয়ের সীমানা ছাড়ায়। শৈলর স্নেহবঞ্চিত, নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে এই মাঠ। কিংবা তারও চাইতে বেশি কিছু। তেপান্তরের মাঠ পেরিয়েই তো আসে রূপকথার রাজপুত্র, উদ্ধার করে বন্দিনী রাজকন্যাকে। শৈল তার রাজপুত্রের প্রতীক্ষায় থাকবে নাকি নিজেই একদিন সুখ দুঃখের বোঝা ফেলে রেখে বেরিয়ে পরবে পথে, প্রান্তরের শেষে সেই বাড়িগুলিতে পৌঁছনোর জন্য, সেই কল্পনার ভার জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর পাঠকের উপরেই ছেড়ে দেন।

বাংলা সাহিত্যের আরও অনেক দিক্‌পাল লেখকের মতো সুবোধ ঘোষেরও জীবনের প্রথম পর্বের চারণভূমি বাংলা নয়, বিহার। মূলত হাজারিবাগ জেলায় কেটেছে তাঁর কৈশোর, প্রথম যৌবন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী থেকে বিমল কর— বিখ্যাত এই লেখকদের গল্প উপন্যাসে বারেবারেই উঠে এসেছে এই অঞ্চলের বিশিষ্ট টোপোগ্রাফি, গ্রামীণ কিংবা আরণ্যক মানুষের জীবন। সুবোধ ঘোষের লেখাতেও আমরা পাই বিহারের গ্রাম কিংবা গঞ্জের ছবি, ব্যবহৃত হয় কয়লা খাদান কিংবা চিনিকলের পরিসর, আদিম জনজাতির মানুষ, বিহারী শেঠ কিংবা বাঙালি বাবুরা ভিড় করে সেখানে। মিশ্র সংস্কৃতির মানুষের জীবন, তাদের দ্বন্দ্ব ও সহাবস্থান, প্রকাশ্য লড়াই ও গোপন রাজনীতি আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে আনেন সুবোধ ঘোষ। কিন্তু কখনো কখনো তাঁর দৃষ্টি আনুভূমিক থাকে না, ভূতাত্ত্বিকের মতো পৃথিবীর কিংবা মানুষের অস্তিত্বের গভীরে নামেন তিনি তুলে আনেন গোপন রূপ এবং রহস্যকে। 'ফসিল'[৩৬] গল্পে নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড়ের রাজা এবং মাইনিং সিন্ডিকেটের মধ্যে বিরোধ বাধে ভীল এবং কুর্ম্মি প্রজাদের নিয়ে যখন রাজপরিবারে পুরুষানুক্রমিক শ্রমদানের ট্র্যাডিশন ভেঙে নগদ মজুরির চুক্তিতে এই প্রজারা খনিশ্রমিক হয়ে যায়। রাজার অন্যতম সচিব, অঞ্জনগড়ের গর্ভের খনিজ ভাণ্ডার যার আবিষ্কার, চেষ্টা করে একটা সমঝোতায় আসার, কিন্তু বিফল হয়। সেই সঙ্গে এও বোঝে বহু ঘাটের জল খেয়ে আসা বৃদ্ধ দুলাল মাহাতোর বুদ্ধিতেই শিশুসুলভ, আদিম, অসভ্য মানুষগুলি নিজেদের আখের বুঝতে শিখেছে। তারপর একই সঙ্গে যখন কয়লা খাদানের ধসে মারা পড়ে বহু শ্রমিক এবং জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে রাজচৌকিদারের গুলিতে মরে বেশ কিছু নারী পুরুষ তখন যুযুধান দুই পক্ষের স্বার্থ মিলে যায়। আসলে পৃথিবীতে যে দুটিই শ্রেণি, ক্ষমতাবান এবং ক্ষমতাহীন, এই সত্য আরও একবার প্রমাণিত হয়। মুখার্জীর বুদ্ধিতে ধরা পড়ে এবং খুন হয় দুলাল মাহাতো। মাহাতোর মৃতদেহ এবং জঙ্গলে মৃত প্রজাদের শব ট্রাক বোঝাই করে এনে ফেলে দেওয়া হয় খনির লেলিহান গহ্বরে, সেই একই পথে যায় শ্রমিকদের হাজিরাখাতা। অঞ্জনগড়ের একটি দিনের রক্তাক্ত ইতিহাস অঞ্জনগড়েরই মাটির তলায় চাপা পড়ে। কার্যসম্পাদনের আনন্দে দেওয়া রাজকীয় পার্টিতে মদিরার রঙিন নেশায় মুখার্জীর মনের আয়নায় ভেসে ওঠে একটি ছবি— "লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্ধপশুগঠন, অপরিণতমস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ির গাঁইতা— কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে

কোয়ার্টস আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই।" এই ছবি তো শুধুই মুখার্জীর অপ্রকৃতিস্থ মনের কল্পনা নয়, এই চিত্রকল্পে ধরা পড়ে ইতিহাসের এক ভিন্ন পাঠ, চাঁদের অন্ধকার পিঠের মতো, যেখানে কোনো আলো পৌঁছোয় না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, ঐতিহাসিকেরা জীবাশ্ম এবং আনুষঙ্গিক তথ্য প্রমাণ জড়ো করে যে বিগত যুগের পুনর্নির্মাণ করেন, তা কতদূর খাঁটি! তা কি আদৌ সত্য নাকি তাকে বানিয়ে তুলে, সাজিয়ে রাখা হয়েছে বহুযুগ আগেই! আমেরিকার কালো মানুষদের লড়াইয়ের আদর্শ বুকে নিয়ে জীবন শুরু করা মুখার্জী বুঝতে পারে ইতিহাস আসলে ক্ষমতাবানেরা তৈরি করে, ঠিক যেভাবে অঞ্জনগড়ের ইতিহাস সে রাত্রে তৈরি হোল তার হাতে।

'সুন্দরম্'[৩৭] গল্পের পটভূমি একান্ত পারিবারিক কিন্তু চিত্রকল্পের নির্মাণে গভীর যোগ রয়েছে দুটি গল্পের মধ্যে। কৈলাস ডাক্তারের ছেলে সুকুমারের সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ভাব দূর করতে পারিবারিক উদ্যোগে চলে পাত্রী দেখা। কর্তার সঙ্গে বাকি সকলের বিরোধ বাধে 'সুন্দরী' পাত্রীর ধারণা নিয়ে। প্রতিদিন লাশকাটা ঘরে মৃতদেহ চিরে তার 'অন্তরঙ্গ' রূপ দেখেন যে কৈলাস ডাক্তার তাঁর কাছে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাই আলাদা। মুখশ্রী বা গাত্রবর্ণের মাপকাঠি তাঁর কাছে মূল্যহীন। পুরো গল্প জুড়েই ব্যঙ্গের একটা প্রচ্ছন্ন সুর কাজ করে যার চূড়ান্ত পরিণতি সমাপ্তির উদ্ঘাটনে, যদু ডোমের কথায়— "শালা বুড়ো, নাতির মুখ দেখছে।" যেন একটা সাপ গোপন বিবর থেকে বেরিয়ে এসে বিষাক্ত ছোবল মারে মধ্যবিত্ত ভণ্ডামির শরীরে। ভিখারিণী তুলসীর অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া এবং বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর জন্য যে দায়ী "ঋষি বালকের মতো কাঁচা মনের" সুকুমার, সেই সত্য উদ্ঘাটিত হয় স্বয়ং কৈলাস ডাক্তারের ছুরির টানে। কিন্তু লাশকাটা ঘরের টেবিলের ওপর যখন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তুলসীর শরীরের অন্তরঙ্গ রূপ, যখন ডাক্তারের ছুরি মুগ্ধ ও কৌতূহলী অভিযাত্রীর মতো পেরিয়ে চলে গিরি, নদী, গোপন গুহাপথ তখন মনে হয় এই চিত্রকল্প শুধুই পরিণতির চমককে আরও নাটকীয় করে তুলতে নয়, তার চাইতেও বেশি কিছু— ". . . কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অচ্ছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ ও নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জাল। . . . খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।" যেন সমুদ্রের গভীর তলদেশে প্রবাল দ্বীপের মধ্য দিয়ে যাত্রা, চারিদিকে খেলা করছে রঙিন মাছেরা কিংবা দুর্গম পর্বতের তুষারাচ্ছন্ন গিরিপথ যাকে প্রকৃতি তার নিজের হাতের কারুকার্যে সাজিয়ে রেখেছে, সেখানে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ। মানুষ তো এইভাবে প্রকৃতিকে, পৃথিবীকে আবিষ্কার করে অপরিসীম মুগ্ধতায়, আবার তাকে বিষাক্ত, নষ্টও করে— "নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন — পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্ব্বর মানব

জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।" সুবোধ ঘোষের চিত্রকল্পের তাৎপর্য এখানেই যে তারা গল্পের দাবি মিটিয়েও তাকে ছাপিয়ে পৌঁছে যায় ইতিহাসের, সভ্যতার মূলগত কিছু প্রশ্নে।

সূর্যমুখী, মীরার দুপুর কিংবা *বারো ঘর এক উঠোনের* স্রষ্টা নৈতিক অবক্ষয়ের ছবি আঁকেন, দেখান কীভাবে মেট্রোপলিটান মন বিকিয়ে যায় খোলা বাজারে। কিন্তু বেশ কিছু ছোটাগল্পে তিনি তাঁর চরিত্রদের সঁপে দেন প্রকৃতির হাতে, নিসর্গের হাতে, ইন্দ্রিয়াসক্ত সংবেদনার হাতে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মানুষের তীব্রতম ইচ্ছে ও আবেগগুলি মনের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ডালপালা মেলে, রূপান্তরিত সত্তায় তারা কেউ হয়ে ওঠে সমুদ্র, কেউ গাছ, কেউ বা সরীসৃপ। অন্তর্জগতের গল্প বলা দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের এক নতুন ঘরানার শুরু তাঁর হাতে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা অনেক সময়েই অ্যালবামের পাতা ওল্টানোর মতো যার পাতায় পাতায় অজস্র ছবি। কখনো বিষয় এক থাকে, বদলে যায় মেজাজ, অভিব্যক্তি। যেমন, 'সমুদ্র'[৩৮] গল্পে অতি সাধারণ একটি তরুণ দম্পতি বেরাতে আসে পুরীর সমুদ্রতীরে এবং দালাল মারফত ওঠে 'প্যারাডাইস' হোটেলে। অচিরেই জানা যায় দালালটি আসলে হোটেল মালিক বীরেনবাবুর মামা। কিন্তু হোটেলের মালিক থেকে কর্মচারী কেউ তাকে পছন্দ করে না, দেখলে এড়িয়ে যায়। যুবকটি প্রথমে কৌতূহলবশে আলাপ জমায় এই মামার সঙ্গে তারপর ক্রমশ তার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। জীর্ণ শীর্ণ শরীর, অ্যাসিডে ক্ষয় হওয়া দাঁত, পাতলা অবিন্যস্ত চুল এবং আধময়লা পোশাকে বৃদ্ধটি যেন কোলরিজের সেই প্রাচীন নাবিক কিংবা ক্ষুধিত পাষাণের মেহের আলী। বৃদ্ধ যুবককে শোনায় সমুদ্রের গল্প, বলে, মাত্র দিনকয়েকের জন্য বেড়াতে এসে সে আর ফিরে যেতে পারেনি, সমুদ্রের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে, জীবন্ত আকর্ষণে আটকে পড়ে আছে কুড়ি বছর। ক্রমশ যুবকটিও গ্রস্ত হয় সমুদ্রের দ্বারা। তার দৃষ্টিতে সমুদ্রের বদলে যাওয়া রূপ ধরা পড়ে চিত্রকল্পের অভিব্যক্তিতে। প্রথম দর্শনে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে মাটির গেরুয়া, ঘাসের সবুজ এবং দুধের সাদা রঙের অনুষঙ্গ— "এখন দিগন্তে ঘেঁসে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে রঙ ধরে; আর একটু কাছে জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্ত প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।" এরপর সমুদ্রকে মনে হয় উদার, মহান— ". . . তটের গায়ে আঘাত করেও সে শান্তি পাচ্ছে না, যেন তৎক্ষণাৎ এতটা করে ভালবাসার ফেনা সান্ত্বনার শুভ্র প্রলেপ বুলিয়ে দিতে এক একটা ঢেউ জল ছেড়ে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। মহতের যা গুণ! . . . বালুর ওপর লুটিয়ে পড়ে সাদা সাদা ফেনার আবেগময় চুম্বন এঁকে দিয়ে ঢেউগুলি আবার নেমে যাচ্ছে।" কিন্তু বৃদ্ধ যুবককে বোঝায় সমুদ্র শুধু নীল আকাশের তলায় নিজেকে মেলে দিয়েই তৃপ্ত নয়, সে জীবন্ত, তার ক্ষুধা আছে। যুবক তখন সেই ক্ষুধাকে প্রত্যক্ষ করে— ". . . রূপালী ফেনা না, কোমল ফুল না; ঝকঝকে মসৃণ নিষ্ঠুর দাঁতের সারি মেলে ধরে ওরা আসছে, একটার পেছনে আর একটা. . .।" ক্ষুধার্ত, উন্মত্ত দানব ক্রমশ যেন প্রবিষ্ট হয় যুবকটির সত্তার গভীরে। রাতে হোটেলের ঘরে যখন সে ঘুমন্ত স্ত্রীকে দেখে আর শোনে বাইরে সমুদ্রের গর্জন তখন তার নিজের ভিতরেই সেই ক্ষুধাকে অনুভব করে— "বাইরে

অন্ধকার বালুর ওপারের শব্দের ঝড় যতনা শুনছি, লোভী নিষ্ঠুর অতৃপ্ত অশান্ত ঢেউয়ের দাঁতালো ভয়ঙ্কর চেহারা যতনা দেখছি, তার চেয়ে আমি বেশি দেখছি আমার বিছানা : কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা একটা নরম তুলতুলে শরীর।" বৃদ্ধটি তার স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছিল সমুদ্রে, বীরেনবাবুর সদ্য কেনা একটি অ্যালসেশিয়নের শাবকটিকেও ছুঁড়ে দিয়েছিল সমুদ্রের ক্ষুধা মেটাতে আর তারপর নিজে আটকে পড়েছিল করাল দাঁতের খাঁজে। যুবকটি এই সম্মোহনের নাগপাশ থেকে একটুর জন্য বেঁচে ফিরে আসতে পারে।

'গিরগিটি'[৩৯] গল্পেও এক সম্মোহিত বৃদ্ধকে দেখা যায় তবে সেই সম্মোহনের কেন্দ্রে এক নারী এবং পটভূমিতে নিসর্গ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জানান[৪০] বালক বয়সে দেখা এক হালুইকরের অপরূপ সুন্দরী স্ত্রীর কথা তাঁর মনে ছিল যখন তিনি গল্পটি লিখেছিলেন। কিন্তু পরিণত বয়সের লেখায় বালকের জায়গা নেয় এক বৃদ্ধ যার মধ্যে বাল্যের সারল্য এবং যৌবনের তৃষ্ণা মিলেমিশে যায়। স্বামী প্রণব অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরের অবসর এবং একাকীত্বটুকু মায়ার কাছে পরম কাঙ্ক্ষিত। অলস মেজাজে হাতের কাজ সেরে সে তাদের টিনের ঘর থেকে গাছগাছালি ঘেরা পথটুকু পেরিয়ে চলে আসে কুয়োর পারে, সেখানে নিমগাছের তলায় আলো ছায়ার জাফরির মধ্যে দাঁড়িয়ে, মাটি, আকাশ, ঘাসপোকার গন্ধ নিতে নিতে স্নানের আরাম তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। অবশ্য পাখি, গিরগিটি, ব্যাঙ, ফড়িং, ঘাসপোকারা ছাড়াও আরও একটি প্রাণী তখন কাছে পিঠেই উপস্থিত থাকে। মায়াদের মতোই সে এই বাড়ির ভাড়াটে, পাঁচিল ঘেঁসা একটা খুপরিতে তার বাস, সে বৃদ্ধ ভুবন সরকার। এই বৃদ্ধের উপস্থিতি ও চলাফেরা এতটাই নিঃশব্দে ও জনান্তিকে যে তাকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয় না মায়ার। এমনকি একদিন স্নানের সময় তাকে দেখেও লজ্জিত বা সচেতন হয়ে ওঠে না মায়া কারণ বৃদ্ধ যেন চারপাশের গাছপালার সঙ্গে মিশে যায়— "পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে কখানা পাঁজর, শনের মতো পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ জোড়া নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনও লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায় কি পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয়না একটা মানুষ, একজন পুরুষ। ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা, নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনো কখনো ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙা পাঁচিলটা কি পেঁপে-জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্রক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে।" গাছ কিন্তু দেখতে পায় না, গিরগিটি দেখে। পাঁচিলে জমে ওঠা শ্যাওলার মখমলের মতো সবুজ আস্তরণের উপর আগুনরঙা ফড়িঙের ওড়াওড়ির দিকে স্থির চোখে যেমন তাকিয়ে থাকে একটা গিরগিটি, ঠিক সেইভাবে মায়াকে দেখে বৃদ্ধ, যদিও তার ক্ষুধা জঠরের নয়, চোখের। ক্রমশ বৃদ্ধের চোখের আয়নায় মায়া নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে, গাছ-গুল্ম-ঘাসে ভরা একটুকরো হরিৎ পরিবেশ যা তার এত প্রিয়, সে যেন এর অংশ হয়ে ওঠে একটির পর একটি চিত্রকল্পে। — "... দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে। ... নতুন গাছ। যৌবন লেগেছে গায়ে।" কিংবা "আরো সুন্দর লাগছিল দিদির থুতনির পাশে যখন ও (প্রজাপতি) ঘুরঘুর করছিল ... আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোন্ ফুলের সঙ্গে কোন্ ফলের সঙ্গে এই থুতনির তুলনা চলে। মচ্‌কা ফুল—না

না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে,—অবিকল সে রকম।" ক্রমশ বৃদ্ধের চোখের আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা মায়ার নেশা হয়ে দাঁড়ায়, স্বামীর সঙ্গ তার অসহ্য বোধ হয়, গভীর রাতে উঠে আসে বিছানা ছেড়ে। এবং বৃদ্ধ যখন পুনরায় বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন এই আশ্চর্য আয়নাটি হারানোর ভয়ে গভীর আশ্লেষে জড়িয়ে ধরে মরা গাছের মতো শরীরটিকে। তখন তাকে বৃদ্ধের মনে হয় চিতাবাঘিনী— "চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘসা কোমর দিদির।" কিংবা, "বাঘিনী, বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে রকম দৃষ্টি, সেই চোখ।"

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের যে ঘরানার সূত্রপাত তা ঐতিহাসিক স্বীকৃতি পেল পাঁচের দশকের শেষে 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলনে। বিমল করের উদ্যোগে প্রকাশিত যে স্বল্পায়ু (মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত) পত্রিকাটির নামে এই আন্দোলনের নাম সেখানে অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী থেকে অনুজ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প প্রকাশিত হলেও বিমল কর স্বয়ং কোনো গল্প লেখেননি এতে বরং শেষ সংখ্যাটিতে লিখেছিলেন একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিকে বলা যায় 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলনের ইস্তাহার বা ম্যানিফেস্টো। এখানে এক জায়গায় তিনি বলেন, ". . . ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার বিবাহ দেবার এই চেষ্টা মূলত গল্পের হৃদয়কে শিল্পসম্মত শুভ্রতা দেবার অভিলাষ। যান্ত্রিকতা থেকে তাকে মুক্ত এবং উন্নত করার প্রচেষ্টা ।" গল্প এবং কবিতায় যখন বিবাহ হয়, তখন তারা একই ঘর ভাগ করে নিতে থাকে, এমনই একটি ঘর চিত্রকল্পের। 'নতুন রীতি'র গল্পকারদের লেখায় চিত্রকল্প নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। বিমল করের নিজের লেখা অবশ্য অধিকাংশই 'দেশ' কিংবা 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত হোত কারণ তিনি তখন 'দেশ'-এর বেতনভুক লেখক। কিন্তু সেখানেই নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটিয়ে দেন তিনি, 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকা প্রকাশের আগেই ১৯৫৭ সালে 'দেশে'ই প্রকাশিত হয় 'সুধাময়' যা নিঃসন্দেহে 'নতুন রীতি'র পথিকৃৎ।

বিমল করের গল্পে চিত্রকল্প মানুষ এবং নিসর্গ, অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎকে রূপময় করে তোলে তো বটেই কিন্তু কখনো কখনো তাকেও ছাপিয়ে যায়। নশ্বর মানবজীবনকে এই বিশ্বচরাচরের অন্তর্গত কোনো ঐক্যের সঙ্গে, কোনো গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত করে তাঁর গল্পের চিত্রকল্প; উর্ণনাভ জালের মতো অদৃশ্য সংহতি সূত্রে কাঁপন জাগে, যা ছিল কবিতার কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা, তাই সত্য হয়ে ওঠে তাঁর গল্পে। চিত্রকল্প হয়ে ওঠে দার্শনিক উপলব্ধির উৎসারণ বিন্দু। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন'[৪১] গল্পে চিত্রকল্প এমনই এক মাত্রায় পৌঁছে যায়। গল্পের শুরু শ্মশানদৃশ্যে। নদীর চরায় জ্বলছে শিবানীর চিতা, একদিকে গাছের ছায়ায় বসে তিন বিগতযৌবন বন্ধু, শিবানীর তিন বয়সের তিন প্রেমিক আর অন্যদিকে একা ভুবন, তার স্বামী। শিবানীর জ্বলন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে কমলেন্দু, শিশির এবং অবনী—শিবানীর তিন প্রেমিকের মনেই নানা প্রশ্ন জাগে, জাগে ক্রোধ, হতাশা, অপরাধবোধ। তারা তিনজনেই একসময় পরস্পরের কাছে দাবি করে শিবানী শুধুমাত্র তাকেই ভালোবেসেছিল। সেই দাবি থেকেই শিবানীর সঙ্গে তাদের গোপন ঘনিষ্ঠতার কথা, অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার কথা তারা পরস্পরকে শোনায়। সেই স্বীকারোক্তি

থেকে তারা নিজেরাই একসময় উপলব্ধি করে যে তারা শিবানীর কৈশোরের, তারুণ্যের, যৌবনের সারল্য, বিশ্বাস, নির্ভরতাকে ভাঙিয়ে তাকে যথেচ্ছ ভোগ করেছে, ব্যবহার করেছে, তারপর একসময় তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। জ্বলন্ত চিতায় তারা তাদের বিভিন্ন বয়সের অপরাধগুলিকে সমর্পণ করে মনে মনে ক্ষমা চায় শিবানীর কাছে। চিতাভস্মে জল ঢেলে যখন তারা ফিরে চলে তখন তিনজনেরই মনে প্রশ্ন জাগে, তারা তো শিবানীর যথাসর্বস্ব নিয়ে তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। তবু তারপরেও ভুবন তাকে গ্রহণ করেছিল। কী পেয়েছিল সে শিবানীর কাছে, কী-ই বা দিয়েছিল তাকে! এর উত্তর গল্পে দেওয়া নেই, আছে শুধু একটি চিত্রকল্প— "চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চার পাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করেছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।" এই ভুবন তো শুধুই একটি মানুষ নয়, স্বয়ং পৃথিবী। সমস্ত আঘাত, যন্ত্রণা, প্রতারণার বিষ যে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, শুশ্রূষা করতে পারে এবং শিবানীর নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়ার পরেও তো সে এই ভুবনের মধ্যেই থাকে। শুধু একটি চিত্রকল্প নারী-পুরুষ সম্পর্কের গল্পকে দেয় এক চরাচরব্যাপী বিস্তার।

সমাপ্তির একটি চিত্রকল্পে মুহূর্তে ভেঙে পড়ে গল্পের ছোট ছবির চারপাশের বাঁধানো ফ্রেমটি, ক্ষুদ্র মানবজীবন স্থান পায় মহাবিশ্বের মাঝে। আবার এমন গল্প আছে যেখানে শুরু থেকেই কায়ার পেছনে ছায়ার মতো চরিত্রদের পায়ে পায়ে এগোয় চিত্রকল্প, নিঃসঙ্গ মুহূর্তে চরিত্রের সঙ্গে চলে তার সংলাপ আবার সমাপ্তিতে পূর্বগামিনী ছায়া দীর্ঘ হয়ে ওঠে, চিত্রকল্প গ্রাস করে চরিত্রকে বা উভয়ে মিলে অভিন্ন সত্তা হয়ে ওঠে। 'শীতের মাঠ'[৪২] গল্পের একেবারে প্রারম্ভিক পংক্তি 'সারাটা দিন মাঠ মুখে করে বসে থাকা' থেকেই ধীরে ধীরে অবয়ব লাভ করতে থাকে চিত্রকল্প। নবেন্দু অসুস্থ, তার বুক পেট জুড়ে প্লাস্টার করা, বিগত এক বছর সে বিছানায় বন্দি। নবেন্দুর স্ত্রী অতসী রেলের মহিলা টিকিট চেকারের চাকরি করে। সকালে কোনোক্রমে স্বামীকে স্নান করিয়ে রেখে অতসী বেরিয়ে যায় স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সারাটা দিন নবেন্দুর কাটে মাঠের দিকে তাকিয়ে, মাঠকে সঙ্গী করে। মাঠটা যেন হয়ে ওঠে তার জীবন। একটি প্রাণোচ্ছল জীবনের ক্রমশ বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার ছবি সে মাঠের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে। একটির পর একটি চিত্রকল্পে বিমল কর সেই বদলে যাওয়াকে দৃশ্যায়িত করেন। সকালের মাঠ প্রাণবন্ত, জীবনের রসে টইটম্বুর— "আরও বেলায় সমস্ত মাঠটা উজ্জ্বল, শীতের গাঢ় তপ্ত রোদ টলমল করছে। আমলকির ঝোপটার দিকে চেয়ে চেয়ে নবেন্দুর মনে হয়, এখন মাঠটা যেন এক ধরণের জীবনের মধ্যে গলে যাচ্ছে।" অভ্যস্ত, যান্ত্রিক হাতে কাজ সেরে অতসী যখন অফিসের জন্য প্রস্তুত হয় তখন নবেন্দুর নিজেকে নির্বাসিত মনে হয়। সে দেখে, "সারা মাঠে একটি উড়ো পাতা নেচে বেড়াচ্ছে। নবেন্দু পাতাটার রঙ দেখতে পাচ্ছে না। শুকনো খসা পাতা বোধ হয়। পাশের ঘরে অতসীর শব্দ।" অতসী চলে যায় সুস্থ মানুষদের পৃথিবীতে, নবেন্দুর মনে অভিমান পাক খেতে থাকে। আর তখন, "মাঠের বুক দিয়ে মস্ত এক ছায়া হু হু করে ভেসে যাচ্ছিল। রোদ একটু চাপা চাপা। নবেন্দু ছায়া দেখতে লাগল।" একসময় কয়েকজন আসে মাঠের গাছ কাটতে, নবেন্দুর মনে হয়, সুস্থ পৃথিবীর মানুষেরা তার জীবন থেকে এইভাবে অতসীকে কেটে নিয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যাচ্ছে তার আশা, স্বপ্ন, আনন্দ। বেলা শেষের মাঠ তার জীবনের মতোই বিবর্ণ হয়ে আসে, "মাঠটা এখন ভীষণ

নিস্তব্ধ, রিক্ত, শূন্য; একটিও পাতা উড়ছে না, একটিও পাখি নেই কোথাও।" আর তারপর, "রক্ত ওঠা অবসন্ন মুমূর্ষুর মতন শেষবার রক্ত তুলে মাঠটা মরে গেল।" রাত বাড়লে একা বিছানায় সে যেন মাঠের সঙ্গে কথা বলে। প্রতিদিন মনে মনে একটু একটু করে দেউলে হয়ে যাওয়ার চাইতে বরং সে শীতের মাঠের মতো রিক্ত, উদাসীন, নিষ্প্রাণ হতে চায়— "এই ঘরে আদিগন্ত মাঠটা সন্ধের পর চুপি চুপি রোজ এসে দাঁড়ায়। সারা রাত ধরে কারা যেন গাছ কাটে। নবেন্দু তবু চুপ করে পড়ে থাকে। একদিন অবশিষ্ট গাছ কটাও কাটা হয়ে যাবে—তখন নবেন্দু আর বিকেলের জন্য কাঁদবে না। আমি কাঁদব না, অতসী; তোমার অপেক্ষা করব না। মাঠ আমাকে নির্বাক নিশ্চল অনড় হতে শিখিয়েছে। মাঠের মতন আমি অন্ধ হব। . . ."

শীতের মাঠের মধ্যে নবেন্দু তার মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছিল কিন্তু বাস্তবে একজন লেখক বিষাদের ধূসর পরদা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন শীতের গলানো সোনার মতো একফালি রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। তিনি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, যাঁর প্রথম দিকের গল্পে বিমল করের বিষণ্ণ জগতের উত্তরাধিকার সবচাইতে বেশি চোখে পড়ে। কৈশোরে, প্রথম যৌবনে এক দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ রোগে আচ্ছন্ন ছিলেন তিনি, পরে তা কাটিয়ে উঠলেও স্মৃতিটা থেকে যায় এবং শীর্ষেন্দু জানান, "সেই সব মনের অভিজ্ঞতাই ছিল আমার পুঁজিপাটা।"[৪৩] তাঁর গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে প্রায়ই তিনি পথ হাঁটেন। একদিকে সংসারী মানুষের 'সুখ'-এর গোলকধাঁধায় পথ হারানো আর অন্যদিকে নিঃশর্ত, নির্দ্বন্দ্ব বেঁচে থাকা—এই দুই জগতের বৈপরীত্য এবং টানাপোড়েন গড়ে ওঠা 'উত্তরের ব্যালকনি'[৪৪] গল্পটি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে অসামান্য কিছু চিত্রকল্পে। তুষার এবং কল্যাণীর সাজানো সংসারের দোরগোড়ায় বসে থাকে পাগল কিংবা অরুণ। অরুণ একসময় কল্যাণীর প্রেমিক ছিল। কল্যাণী তাকে প্রত্যাখ্যান করার পর সে পাগল হয়ে যায় এবং তুষার-কল্যাণীদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের ফুটপাতে গাছের তলায় এসে বসে থাকে। প্রথম প্রথম তুষাররা ভীত, আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল, বিশেষত কল্যাণী। পাগলকে ক্ষুধার্ত মনে করে ভয়ে ভয়েই খাবার পাঠিয়েছিল তারা। পাগল বিনা বাক্যব্যয়ে সেসব খেয়ে বকুল গাছের তলাটিতেই বসে থেকেছিল। এইভাবে কেটে গিয়েছিল দিন, মাস, বছর। তুষার-কল্যাণীর সংসার আরও ভরে উঠেছিল, তাদের ফুটফুটে মেয়ে সোমা, তুষারের পদোন্নতি— সব মিলে যেন থই থই সুখের বন্যা। আর শতছিন্ন পোষাকে, জটপরা চুলে আর নোংরা শরীরে অরুণের পরিচয় সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে সে হয়ে উঠেছিল পুরোদস্তুর রাস্তার পাগল। এটা বাইরের গল্প, ফলের খোসার মতো। লেখক যখন ধীরে ধীরে ওপরের খোসাটি ছাড়িয়ে নেন তখন দেখা যায় ভেতরের রং, স্বাদ, গন্ধ সবটাই আলাদা। এই ভেতরের তুষার একজন ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ মানুষ। অফিসের কাজের চাপ, পদোন্নতির সিঁড়িটাকে আঁকড়ে থাকার ছেদহীন চেষ্টা তাকে আরও শ্রান্ত, ক্লিষ্ট করে তোলে। স্ত্রী-কন্যার সাহচর্য, এমনকি নিনা নামে অভিজাত বারবণিতার সঙ্গও তাকে এই বিষণ্ণতা থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তুষারের শূন্যগর্ভ অন্তর্জগতের প্রতিরূপ একটি চিত্রকল্প ধ্রুবপদের মতো ফিরে ফিরে আসে— "একটা বিশাল বাড়ির কাঠামো উঠছে। দশ কি বারোতলা উঁচু লোহার খাঁচা। ইঁট কাঠ বালি আর নুড়ি পাথরের স্তূপ ছড়িয়ে আছে। নিস্তব্ধ হয়ে আছে কংক্রীট মিক্সার, ক্রেন হ্যামার উটের মতো গ্রীবা তুলে দাঁড়িয়ে। জায়গাটা প্রায় জনশূন্য। কুলিদের একটা বাচ্চা

ছেলে পাথর কুড়িয়ে ক্রমান্বয়ে একটা লোহার বীমের গায়ে টং টং করে ছুঁড়ে মারছে। ঘণ্টাধ্বনির মতো শব্দটা শোনে তুষার।" এই বিশাল বাড়ির অন্ধকার অবয়ব, ক্রেন হ্যামারের কাঠামো এবং পাথর ছোঁড়ার শব্দ তার সমস্ত কাজ, অবসর, শান্তির মুহূর্তে ভূতের মতো জেগে উঠে তাকে অস্থির, অশান্ত করে তোলে। রাতে ঘুমের মধ্যে যেন স্বপ্ন দেখে চমকে জেগে ওঠে— "কিসের শব্দ ওটা? অন্ধকারে উঁচু গ্রীবার মতো নিস্তব্ধ ক্রেন হ্যামারটা সে কোথায় দেখেছে? কবে?" অফিসের কাজের ভিড়ে ডুবে থেকেও "মাথার ওপর সব সময় উদ্যত ক্রেন হ্যামারটাকে টের পায় তুষার।" নিজের জীবনের বিষাদপর্বের প্রসঙ্গে শীর্ষেন্দু একসময় লিখেছিলেন[৪৫], "একদিন হঠাৎ আমার চারদিকে গমগম করে ঘনিয়ে এল ঘোর বিষণ্ণতা, এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার পর। কাউকে সে যন্ত্রণার কথা বলতে পারি না . . .অস্তিত্বে বিপদের সঙ্কেত বাজতে থাকে। মনে হয়—'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা। আমার পথেই শুধু বাধা? আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?'. . ." বোঝা যায়, নিজের অব্যক্ত অনুভূতিগুলিকেই লেখক সঞ্চারিত করে দিয়েছেন তুষারের মধ্যে। জীবনানন্দীয় 'বোধ' তাড়িত মানুষ তিনি নিজে আর তাঁর চরিত্র তুষার 'আট বছর আগের একদিন'-এর সেই লোকটি, 'উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে'[৪৬] যাকে জাগিয়ে তুলেছিল সুখশয্যা থেকে। তুষারের চেতন-অবচেতনে ফিরে ফিরে আসা ক্রেন হ্যামারটির সঙ্গে জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতার মিল নিঃসন্দেহে আপতিক নয় বরং বিশ্বস্ত আত্মীকরণ। জীবনানন্দের কবিতার মানুষটি একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের কাছে গিয়েছিল আর তুষার যেতে চায় বকুল গাছের তলায় বসে থাকা পাগলের কাছে। অরুণ মরে গিয়ে জন্ম নিয়েছে এই পাগল। যার জীবনে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, স্বপ্ন নেই, প্রতিশ্রুতি নেই, নেই প্রত্যাশা পূরণ। চারপাশের উর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা আর নাগরিক জনস্রোতের মাঝে একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা যেন এই পাগল যাকে ঘিরে থাকে একটুকরো প্রকৃতি— "ঠিক যেন এক নদীর পাড়ে বসে আছে পাগল। কী সুন্দর আবছায়া নদীটি। চারিদিকে আধো আধো অন্ধকার। অনন্ত সন্ধ্যা। নদীটি বয়ে যায় অবিরল। স্মৃতি বিস্মৃতিময় তার স্রোত। পাগল প্রত্যক্ষ করে। ক্লান্তি আসে না। বকুলের গাছ থেকে পাতা খসে পড়ে, কখনো ফুল, বৃষ্টি আসে, ঝড় বয়ে যায়, আবার দেখা দেয় রোদ। তবু আবছায়ায় নদীটি বয়ে যায়। বয়ে যায়।"

একটি গল্প লিখতে তাঁর সময় লেগেছিল পৌনে দু'বছর, একসময় মনে হয়েছিল তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বুঝি মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত গল্প জুড়ে মৃত্যুর তটদেশ ছুঁয়ে আসার অনুভূতি। এমনটাই জানাচ্ছেন শীর্ষেন্দু[৪৬] তাঁর 'স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু'[৪৭] গল্পটি সম্পর্কে। 'উত্তরের ব্যালকনি'র তুষারের মতোই সাধারণ ছাপোষা গৃহস্থ মাখনলালের জীবনের ট্রেনটা হঠাৎই এক সন্ধ্যায় লাইন ছেড়ে মাটি ছুঁতে চায়। ডালহাউসি পাড়ায় অফিস থেকে বেরোতে সেদিন কিছুটা দেরি হয় তার। শহরতলির বাড়িতে ফেরার জন্য শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার আগে কিছুটা এলোমেলো ঘোরে মাখনলাল। ওজনমেশিনে ওজন নেয়। তাতে লেখা থাকে সামনের দিনে শীঘ্রই সে বিপদে পড়তে চলেছে। এরপর মাখনলাল একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকে, সেখানকার উচ্চকিত ড্রাম বাজার শব্দ, মুখে রঙ মাখা মহিলা এবং কাউন্টারে দাঁড়ানো বিপুলাকৃতি এক ব্যক্তিকে দেখে বিপন্ন বোধ করে যখন সে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে তখনই, ". . .তার মনে হল ভিতর থেকে কেউ আগুনের মতো একজোড়া চোখ তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই নামিয়ে নিল।"

এই চোখ তার সমগ্র অস্তিত্বকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে যায় যেন। এরপর রেস্তোরা থেকে বেরিয়ে শিয়ালদায় ট্রেন ধরে মাখনলাল তার বাড়িতে পৌঁছোয় ঠিকই কিন্তু চারপাশের চেনা জগৎটাকে আর আগের মতো করে অনুধাবন করে না, যেন সবই কিছুটা বদলে যায়। এই বদলে যাওয়া জগৎ বিমূর্ত ছবির মতো ধরা দেয় চিত্রকল্পে— "অবাস্তব এসপ্ল্যানেড দুলে দুলে সরে যায়। ভেঙে পড়া দুর্গের অবশিষ্ট একটি মাত্র স্তম্ভের মতো মনুমেন্ট। কারা তার সঙ্গে হাঁটছে, উল্টোমুখো হাঁটছে, সামনে পেছনে এলোপাথাড়ি তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের অবয়ব, মুখ এবং শো-কেসে, আয়নায় প্রতিবিম্বিত তাদের গোলাকার, কখনো লম্বাটে অ্যাবস্ট্রাক্ট চলন্ত ভগ্ন অবশেষ।" একসময় এই বিমূর্ত প্রহেলিকার উপর বৃষ্টি নামে— ". . . সে জুন মাসের প্রথম বৃষ্টিপাত দেখল। হাজারটা থার্মোমিটার ফুটপাতে আছড়ে পড়ে ভাঙছে।" তারপর বাসের মিশ্র ভিড়ের মধ্যে বন্ধ জানালার ওপারের বৃষ্টিকে তার মনে হয়, ". . . সে দূরগামী হরিণের লঘু পদশব্দের মতো বৃষ্টির শব্দ শুনছিল। মনে হয় চারপাশের সবকিছু হঠাৎ কোথায় যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। সিঁড়িতে, ফুটপাথে, রাস্তায়, ডবল-ডেকারে—সবকিছুর ওপর চরাচর জুড়ে প্রবল হরিণের মতো লাফিয়ে ছুটছে বৃষ্টি।" মাখনলালের পায়ের তলাকার মাধ্যাকর্ষণের টানটা হঠাৎই যেন সরে যায়, তার ইন্দ্রিয়গুলি অলৌকিক গবাক্ষ হয়ে জাগতিক অনুভূতিগুলিকে করে তোলে অনন্ত প্রসারিত। সেদিন ঘুমের মধ্যে একটির পর একটি স্বপ্নের ঢেউ তাকে যেন নিয়ে চলে মৃত্যু-সমুদ্রের দিকে।

"ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলী। তার মজা। তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া।" নিজের লেখার ভরকেন্দ্রে আছে তাঁর নিজেরই জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা কল্পনা, যা কিনা সেই জীবনেরই সম্প্রসারণ—এমনটাই জানান শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়[৪৮]। তাঁর 'সেই মাছটা'[৪৯] গল্পের ইস্কুল বালক শঙ্কর তিনি নিজেই। মফঃস্বলের জেলা স্কুলের ক্লাস নাইনের ছাত্র শঙ্কর রায় চেহারা, মেধা সব দিক থেকেই অতীব সাধারণ। সে শশাঙ্কতিলকের মতো প্রতি বছর ফার্স্ট হয় না বা আনন্দগোপালের মতো তুখোড় ইংরাজিও লিখতে পারে না, কোনোমতে পাশ নম্বরটুকু পেয়ে ক্লাসে ওঠে। এমনকি বংশীর মতো ছবি আঁকতেও পারে না। আনন্দগোপাল, শশাঙ্কতিলক বা বংশীর কেরামতি দেখে তার তাক লেগে যায়, মনে হয় ওরা ম্যাজিক জানে, এমন কোনো ম্যাজিক কি ওর মধ্যেও নেই! একদিন সেই ম্যাজিক দেখানোর সুযোগ এসে যায়। ইতিহাসের ক্লাসে মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশে সে গল্প বলে, যেন কল্পনাকে ইতিহাসের সাজ পরায়। সে বলে একটা মাছের গল্প, যে বিশাল মাছটা আসলে মাছ নয়, একটা ছেলে, নাম মতিলাল যে ১৮৯৪ সালে পা পিছলে ভৈরবের জলে পড়ে গিয়েছিল, তারপর এতগুলো বছর পার করে ভেসে উঠেছে। ক্লাসের ছেলেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে আর শঙ্কর মনে মনে উল্লসিত হয়ে ভাবে তবে সে-ও পারে, তার মধ্যেও ম্যাজিকটা আছে! ছুটির পর বন্ধুরা চেপে ধরলে সে স্বীকার করে যে গল্পটি তার বানানো, সামুদ্রিক ঢাইন মাছের টুকরো সে চোখে দেখেছে, যা দেখলে আন্দাজ করা যায় আস্ত মাছটা হবে বিশাল বড়, সাদা, পুরু তেলে ঢাকা দুপিঠ। সেই আন্দাজটুকুর ওপর রঙ চড়িয়ে তৈরি করেছে বাকিটা। বন্ধুদের মুগ্ধতা কিন্তু তাতে কমে না বরং বেড়ে যায়, পরীক্ষার উত্তর গুছিয়ে লিখতে পারে না যে ছেলেটা সে কেমন ভাবে এমন একটা

গল্প বানাতে পারল! শঙ্করকে কেউ বলে ছবি আঁকতে, কেউ বলে বাংলা রচনায় সে নির্ঘাত খুব ভালো করবে। তারপর সময়ের নিয়মে সময় কাটে, জেলা স্কুলের পাট শেষ করে সবাই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বংশী আর শশাঙ্কতিলক ডাক্তারি পড়তে যায়, বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের চাপে আনন্দগোপাল সরকারি মিন্টে চাকরি করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যখনই শঙ্করের দেখা হয়, তারা জিজ্ঞাসা করে সেই মাছটির কথা। শঙ্কর বলে, মাছটা বড় হচ্ছে ক্রমশ, বালকের আকার থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকারে পৌঁছেছে। এইভাবে মাছটা তাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। একদিন কিশোর শঙ্কর মাছটাকে গড়ে তুলেছিল আপন কল্পনায়, একটা সময়ের পর মাছটাই তাকে গড়ে তুলতে থাকে, সেই মাছটার জন্যই যেন নিয়তি নির্ধারিত পথে সে লেখক হয়ে ওঠে। সফল ডাক্তার শশাঙ্কতিলক তরুণী কন্যাকে অকালে হারিয়ে, নিজে হৃদ্‌রোগে মৃতপ্রায় হয়েও যেন অদৃষ্টের কোনো ইঙ্গিত খুঁজতে বন্ধুকে প্রশ্ন করে, মাছটা কি আর কখনো মতিলাল হতে পারবে? আনন্দগোপালের মনে হয় মাছটা তার ভাগ্য ফেরাতে পারে যেমন ভাবে শঙ্করের ফিরিয়েছে। তাই সে মধ্যবয়সে বিয়ে করে কপাল ঠুকে কলকাতা থেকে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এই মানুষগুলির যাপিত জীবনের মুহূর্তগুলিকে, আশা আকাঙ্ক্ষাকে, অজ্ঞেয় ভবিতব্যকে যেন নিয়ন্ত্রণ করে সেই মাছটির অনৈসর্গিক উপস্থিতি। সমস্ত গল্প জুড়ে বার বার ফিরে আসে সেই মাছটির চিত্রকল্প। কখনো বেঁচে থাকার প্রেরণা হয়ে, কখনো মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা দৈববাণীর মতো। "তার চোখের সামনে ঢাইন মাছটা বড় হয়েই চলেছে। আকাশে মেঘ করলে কোনও কোনওদিন বিকেলে সে দু'খানা মেঘের ফাঁকে মাছটাকে দেখতে পায়। আকাশের প্রায় এমাথা থেকে ওমাথা অব্দি শুয়ে আছে। একসময় কুকুরের গুটিয়ে যাওয়া লেজের মতোই নিজের লেজটা খুব মনোহর ভঙ্গিতে খানিকটা শূন্যে তুলে ঢাইন মাছটা আকাশ থেকেই শঙ্করের দিকে এক চোখে তাকিয়ে হাসে।" কিংবা, ". . . শঙ্কর দেখতে পেল— রেনট্রি গাছটার কোন শতাব্দী প্রাচীন মোট গুঁড়ির একটা প্রমাণ সাইজের ডালের খুঁটি খাটা মোটা বাকলের ওপর আগাগোড়া সাদা গা বের করে সেই মাছটা শুয়ে আছে। এক চোখে হাসি বের করে সে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে। . . . আর লেজটা মাঝে মাঝে একটু তুলে যেন কোন অদৃশ্য সুরের সঙ্গে তাল দিচ্ছে। এই তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরে যেন কিছুই হয়নি। কিছুই ঘটেনি। পৃথিবী সেই পরিমল স্যারের ক্লাসে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সূর্যটাই ঘুরে চলেছে।" দিনগত পাপক্ষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত মানুষগুলির গোপন স্বপ্নের মধ্যে মাছটা বেঁচে থাকে, যে তাদের চুপিচুপি বলে, মানুষ ডুবে গিয়ে মাছ হয়ে ভেসে ওঠার মতো অলৌকিক কিছু জীবনে ঘটে গেলেও যেতে পারে।

এই কলকাতা শহরের নাগরিক বাঁশিওয়ালা মতি নন্দী। হ্যামলিনের এই রহস্যময় বংশীবাদকের মতো তাঁর গল্প উপন্যাসের কথার টানে উত্তর কলকাতার পলেস্তারা খসা বাড়ির অন্ধকার, স্যাঁতস্যাতে ঘর থেকে, শ্যাওলাধরা চাতাল কিংবা সিমেন্ট উঠে যাওয়া রোয়াক থেকে সরু, বিসর্পিল গলিপথ দিয়ে আমাদের সামনে এসে পৌঁছোয় সদাগরী অফিসের কেরানি, রোয়াকে বসে পরচর্চায় জীবন কাটিয়ে দেওয়া বৃদ্ধ, ভাড়াটে বৌটিকে চোরা চোখে জরিপ করা মধ্যবয়স্ক বাড়িওয়ালা, পরদা ফেলা রিকশায় ম্যাটিনি শো দেখতে যাওয়া গৃহিণী, বিয়ের অপেক্ষায় ক্রমাগত বয়স লুকোতে লুকোতে ক্লান্ত যুবতী, টিউশানি করে পড়া চালানো তরুণ,

বাড়িতে লুকিয়ে রাস্তায় ডাংগুলি খেলা বালক, সাত বাড়ি চড়ানো ঝানু ঝি. . .এমন আরও অনেক চরিত্র। সিপিয়াতে এই মানুষগুলির ছবি আঁকলেও কখনো কখনো তাতে গাঢ় রঙের ছোঁয়া লেগেছে। চিত্রকল্প রচনায় মতি নন্দীর ঘরানা সেই শিল্পীদের, যাঁরা গেরিমাটি বা কাঠকয়লার মতো দেশজ উপাদান ব্যবহার করেন রং তৈরি করতে। যে জীবনের ছবি আঁকেন মতি নন্দী, সেই জীবনকেই চূর্ণ করে বানিয়ে নেন রং। 'বেহুলার ভেলা'[৫০] গল্পের প্রমথর বাস উত্তর কলকাতার গলিঘুঁজির ভিতর এমন এক বাড়িতে, 'সকালও যার মুখ দেখে না/বিকেল করে আড়ি'। স্ত্রী এবং চার সন্তানকে নিরন্তর অভাব এবং হতাশা ছাড়া সে জীবনে কিছুই দিতে পারেনি এবং পারবেও না। কারণ তার কেরানি জীবনে নতুন করে কিছু হওয়ার বা পাওয়ার সম্ভাবনা সে দেখে না। এহেন প্রমথকে লেখক এক গ্রীষ্মের পড়ন্ত দুপুরে দাঁড় করিয়ে দেন বাজারের মধ্যে। দুপুরের অবকাশে প্রায় জনশূন্য বাজারের মধ্যে সে যেন প্রত্যক্ষ করে এক বৃহৎ সময়ের পাশপরিবর্তন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে পথ হেঁটেছে যে সময়, সচ্ছল মধ্যবিত্তকে দারিদ্র্যসীমার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে যে সময়। তার বাল্যে, কৈশোরে এই বাজারে সে যাদের দেখেছে তেমন অনেকগুলো মুখ হারিয়ে গেছে দাঙ্গায় কিংবা দুর্ভিক্ষে। অবচেতনে ধৃত সেই মুখগুলিরই যেন ছায়া পড়ে বাস্তবে যখন প্রমথ দেখে, "ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারপাশে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি।" স্মৃতির সরণি বেয়ে এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে পেছন থেকে একটা ডাক শুনে ঘুরে তাকায় প্রমথ এবং দেখে, "সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিল্কের শাড়িজড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।" সমস্ত অবদমিত আকাঙ্ক্ষার শিকড়ে থাকে যে ক্ষুধা এবং যৌনতা, ঝুলন্ত পশুশরীরের চিত্রকল্পে তাকেই প্রকাশ করলেন মতি নন্দী। প্রমথর জীবনের সমস্ত অপ্রাপ্তি এবং অবদমিত ইচ্ছাগুলি ওই ঝুলন্ত প্রাণীটির শরীরের মাংসের রূপ নেয়। কিন্তু শুধুই হয়তো তাই নয়, চিত্রকল্পটি গভীরতর স্তরে আরও হয়তো কিছু বলে। মানুষের, শুধু মানুষের কেন, যেকোনো প্রাণীর মূলগত প্রবৃত্তি বা basic instinct হল, ক্ষুধা এবং যৌনতা। আবার সেই প্রবৃত্তিই কিন্তু জীবনের চালিকাশক্তি। ঝুলন্ত ছাগমাংস দেখে প্রমথর তীব্র আকর্ষণ সেই প্রবৃত্তিরই তাড়নায়, যা তাকে যান্ত্রিক জীবনযাপন থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি যোগায়। আবার সেইসঙ্গে শিকার ও শিকারীর, খাদ্য ও খাদকের চক্রও তো বিশ্বজনীন। চতুষ্পদ প্রাণীটিকে তার বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি তো বাঁচাতে পারেনি শেষপর্যন্ত, প্রমথকে কি পারবে বাঁচাতে! এই সংশয় এবং প্রশ্ন মাংসের ঠোঙা হাতে বাড়ি ফেরা প্রমথকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। অপ্রত্যাশিত সুখাদ্যের সম্ভাবনায় স্ত্রী অমিয়া এবং সন্তানদের চোখে আলো ঝলসে উঠলেও দেখা যায় সাংসারিক তুচ্ছ টানাপোড়েন কিংবা মানসিক দৈন্যের ঊর্ধ্বে তাদের পৌঁছে দিতে পারেনা মহার্ঘ্য মাংসখণ্ডগুলি বা তার রন্ধনের সুবাস। প্রমথ বুঝতে পারেনি, এ সংসারে শখ, আহ্লাদ, প্রশ্রয়ের মতো ব্যাপারগুলো অব্যবহৃত চিনেমাটির বাসনের মতো বহুকাল পড়ে থেকেছে। আজ ধুয়েমুছে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নিঃশব্দে অজস্র সূক্ষ্ম ফাটল ধরে গেছে তাতে, যেকোনো মুহূর্তে চুরমার হয়ে ভেঙে যেতে পারে, নিজে থেকেই। অমিয়াও অতি তুচ্ছ কারণে ফেটে পড়ে খানখান হয়ে; তার হিংস্র এবং অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো প্রমথর মনে হয় তার "চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে", পরমুহূর্তেই যা "মরা পাঁঠার চোখের

মতো ঘোলাটে হয়ে যায়। অর্থাৎ খাদ্য ও খাদক, শিকার ও শিকারির অবস্থান পাশার দানের সঙ্গে সঙ্গে বদলে বদলে যায়। প্রমথ ভেবেছিল, একদিন মহার্ঘ্য মাংস কিনে ফেলতে পেরে সে কিছুটা দান জিতে গেছে। কিন্তু সে বোঝেনি, আরও বড় কসাইয়ের হাতে সে, তারা সকলে একটু একটু করে জবাই হচ্ছে। তার হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, মাংসপেশীর মতো ভালোবাসা, বিশ্বাস, আস্থা, নির্ভরতাকে কেউ যেন কেটে কেটে বেচে দিয়েছে। বাজার থেকে কিনে আনা পাঁঠার মাংসের জায়গায় নিজের রক্তাক্ত, খণ্ড বিখণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে যেন প্রত্যক্ষ করে প্রমথ— "মাসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর, থকথক করছে যেন রক্ত।" রাত গভীর হলে বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে পাশাপাশি বসে থাকে স্বামী-স্ত্রী। প্রমথ একসময় অমিয়াকে বলে, "অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কাজ নেই।" মৃত চতুষ্পদের চিত্রকল্পটি এখানে এসে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে।

কথাসাহিত্যের বিষয় হিসেবে রাজনীতি সেই বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ থেকে চলে আসছে। পরবর্তী লেখকেরা কমবেশি অনেকেই তাঁদের রাজনৈতিক মনোভঙ্গি ব্যক্ত করেছেন গল্প উপন্যাসে। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে পৌঁছে দেখা যায় মার্কসবাদী চিন্তাধারা কয়েকজন অত্যন্ত প্রতিভাবান গল্পকারের প্রায় সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে নিয়েছে। অসীম রায়, দেবেশ রায় কিংবা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় মূলত রাজনৈতিক গল্পকার হিসেবেই। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, যেসব গল্পে রাজনৈতিক ডিসকোর্স তুলে আনা হয় সেখানে চিত্রকল্প বা প্রতীকের মতো বিষয়গুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ব্যাকসিটে। একেবারেই যে থাকেনা এমন কথা হয়তো বলা যাবে না কিন্তু গুরুত্ব পায় বক্তব্য, বিতর্ক বা সংঘাতের সরাসরি উপস্থিতি। কিন্তু এই লেখকদেরই এমন কিছু কিছু গল্প রয়েছে যেখানে সরাসরি রাজনীতি নেই কিন্তু আছে মানুষে মানুষে সম্পর্কের যৌথতা কিংবা ক্ষয়ের অসামান্য শৈল্পিক উপস্থাপন, আছে গোধূলির আকাশের বিরল রামধনুর মতো চিত্রকল্প।

অসীম রায় আজীবন বিভিন্ন বিখ্যাত ইংরাজি দৈনিকে সাংবাদিকতা করেছেন। ফলত, একধরনের ঝকঝকে স্মার্টনেস তাঁর গদ্যের বিশেষত্ব। তাঁর অনেক গল্পেই রিপোর্টাজের আদল ধরা পড়ে। কিন্তু স্টাইল তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতো না, তিনি নিজেও জানতেন কি করে স্টাইলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যেমন, 'ডনাপলা'[৫১] গল্পে ঈষৎ ব্যঙ্গের চাপা হাসি নিয়ে এগিয়ে চলা ন্যারেটিভটিকে মুখোশের মতো একটানে খসিয়ে ফেলে পরিণতির চিত্রকল্প। টুরিসিম্ কোম্পানির লাক্সারি বাসে গোয়ার নানা দ্রষ্টব্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় মানব এবং রমলা। তারা নববিবাহিত দম্পতি, গোয়ায় মধুচন্দ্রিমা যাপনে এসেছে। গল্প ক্যামেরার মতো বাসটিকে, তার অভ্যন্তরে মানব-রমলাকে এবং অন্যান্য যাত্রীদের অনুসরণ করে। বাইরের দৃশ্যের দিকে বড় একটা মনোযোগ নেই মানব-রমলার, তারা তাদের বিয়ের প্রাপ্তির হিসেবনিকেশ, ভবিষ্যতে আদায়ের সম্ভাবনা এবং শ্বশুরবাড়ির ভালো মন্দের আলোচনায় মশগুল হয়ে থাকে। কারণ বাইরে, "সবই তো একরকম। সেই নীল জল আর বালি।" সহযাত্রীদের কেউ নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন, কেউ দারচিনি-এলাচ কিনতে ব্যস্ত আবার কেউবা কোম্পানির পয়সায় ভারতভ্রমণের গল্প বলতে বলতে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন। বিভিন্ন দ্রষ্টব্য ঘুরে বাস পৌঁছোয় ডনাপালায়, গাইড শোনায়

ষোড়শ শতাব্দীর এক প্রেমকাহিনি। পর্তুগীজ গভর্নরের মেয়ে ডনাপলা প্রেমে পড়েছিল স্থানীয় এক জেলে যুবকের। অভিভাবকেরা তাকে পর্তুগালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলে জনা পলা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, তার আত্মহনন স্থানটিই শেষ দ্রষ্টব্য। বাসের মানুষগুলির এতক্ষণের আত্মকণ্ডুয়ন হঠাৎই যেন থমকে যায় এই দৃশ্যের সামনে। জীবনকে তুচ্ছ করা শতাব্দী প্রাচীন প্রেমকে ব্যাপ্ত নিসর্গের পটে গড়ে ওঠা চিত্রকল্প অবিনশ্বর করে তোলে— "এক অন্য সুর, এক অন্য গান, এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের জগতে থেকেও যা অতীন্দ্রিয়, পার্থিব হয়েও অপার্থিব। যাত্রীরা বাস থেকে নেমে থমকে দাঁড়ায়। এত নীল তারা আগে কখনো দেখেনি, আর সে নীলে সামান্য কর্কশতা নেই চাঞ্চল্য নেই। . . . চারদিকে নীল, তারই মাঝখানে পাথরের ধাপকাটা এক পাহাড়ের তর্জনী। এই পাহাড়ের তর্জনী বেয়ে চারশো বছর আগে এক পর্তুগীজ ষোড়শী ত্রিভুবন উপেক্ষা করে চারপাশের নীলে মিলে গিয়েছিল।. . . রমলা-মানব টের পায় ডনা যেন পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। তার চিকন গায়ের ঝাপ্টা তাদের গায়ে এসে লাগে। এই স্থির নীলের মধ্যে পবিত্র এক শিখার মতো প্রেম জ্বলছে চারশো বছর ধরে।" রমলা-মানব এবং বাসের প্রতিটি মানুষ অনুভব করে কতো তুচ্ছ, কতো অকিঞ্চিৎকর জীবন তারা যাপন করে। কিন্তু সেই সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পায় তারা। টবের গাছ যেমন বনস্পতিকে চেনে না, খাঁচার পাখি যেমন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও আকাশে উড়তে ভয় পায়, তেমন ছোট ঘেরা সীমিত পরিসরের এই মানুষগুলির অস্বস্তি হয় ডনা-পলার অপার্থিব, প্রায় অলৌকিক প্রেমকাহিনির সামনে।

দেবেশ রায়ের গল্প সম্পর্কে বিমল কর এক সময় বলেছিলেন, "দেবেশের লেখার বিষয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা জানেন একেবারে গোড়া থেকেই দেবেশ এই স্টাইল রপ্ত করার জন্য প্রাণপাত করেছে। তার কম বয়সের 'দুপুর' কিংবা 'অসুখ' পড়লেই সেটা বোঝা যায়"[৫২] এর মধ্যে 'দুপুর'[৫৩] গল্পটিতে দেবেশীয় 'স্টাইলের' বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, এখানে গল্প গড়ে তোলার সহযোগী উপাদান হিসেবে তিনি চিত্রকল্পকে ব্যবহার না করে গল্পটিকেই পুরে ফেলেছেন চিত্রকল্পের কাঠামোয়। পুরো গল্প জুড়ে একটির পর একটি তাস সাজিয়ে যাওয়ার মতো সাজিয়ে গেছেন চিত্রকল্প। দুপুর—দিনের মধ্যবর্তী একখণ্ড সময়, যার নিজস্ব কোনো অবয়ব নেই, এই গল্পে রঙিন তরলের মতো সেই দুপুর প্রবিষ্ট হয় পাঁচটি চরিত্রের অন্তর্জগতে এবং পাঁচটি স্বতন্ত্র অবয়ব লাভ করে। এক রবিবার মধ্যাহ্নভোজনের সময় গল্পের শুরু। মধ্যবয়স্ক যতীনবাবু, তাঁর বিগতযৌবনা স্ত্রী রেণুবালা এবং কৈশোর ও যৌবনের মধ্যবর্তী তাঁদের দুই কন্যা মায়া ও সতী এবং পুত্র মুকুল যখন স্নান খাওয়া ইত্যাদি অভ্যস্ত কাজগুলি সারে, তখন দুপুরটা পোষা কুকুরের মতো তাদের পায়ে পায়ে ঘোরে। তারপর যখন তারা বিশ্রাম এবং ঘুমের আয়োজন করে, তখন দুপুরটা এগিয়ে এসে তাদের জাপটে ধরে এবং বিদেহী আত্মার মতো তাদের সত্তার রূপ লাভ করে। যতীনবাবুর দুপুর: "অনেক ছেলের মা, শিথিল দেহ, শ্লথযৌবন নারীর মতো দুপুরটা হাঁফসাচ্ছে। জিভ আর দুপাশের দুটো ছুঁচল দাঁত বের করে দুপুরটা পড়ে আছে মাদি কুকুরের মতো।" রেণুবালার দুপর: "ছোট্টখাট্টো ভুঁড়িঅলা মাঝবয়সি এক ভদ্রলোকের মত দুপুরটা ঘুমুচ্ছে। দুপুরের শরীরের শক্তিটা চর্বি হয়ে যাচ্ছে, চর্বিটা হাড়টাকে ঢেকে দিচ্ছে, হাড়ের স্পর্শ আর পাওয়া যাচ্ছে না, মোটা থলথলে ভুঁড়ি যেন গায়ের সঙ্গে লাগে

আর পিছলায়।" মুকুলের দুপুর: "কিশোরীর মত দুপুরটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে, ভরে উঠছে। খুব চেনা, অথচ রহস্যময়। সুন্দর। দূরে দাঁড়িয়ে। মাঠে ফুটবল খেলতে খেলতে দেখা কোনো দোতলা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো মেয়ের মতো—দূরের, তাই মনের কাছের, তাই সুন্দর।" মায়ার দুপুর: "দুপুরটা ফটোয় দেখা পুরুষকে কল্পনা করার মতই বাস্তব অথচ অলীক। আর আশঙ্কায় দুরুদুরু, সম্ভাবনায় রঙিন, ব্যর্থতার ধবধবে।" সতীর দুপুর: "টইটম্বুর, টসটস করছে দুপুরটা। মধ্যসমুদ্রের মত নিস্তরঙ্গ, বিরাট, ব্যাপক; চুম্বক পাহাড়ের মত আকর্ষক; ফুলশয্যার পুরুষের মত স্থির, সবল, জলন্ত।" কারও দুপুর গার্হস্থ্য, কারও কাছে ভবিষ্যতের হাতছানি, কারও কাছে দূর থেকে দেখা এবং নিবিড় করে চাওয়া, কারওবা অব্যক্ত আবেগের শিহরণ। পাঁচজন মানুষের অন্তর্মহলের ঘর-দুয়ার-অলিন্দের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় দুপুর, তাদের চেনা-অচেনা জগৎ, বাস্তব এবং স্বপ্ন দুপুরের সাজ পরে দেখা দেয় গল্পে। ছোটোগল্পের আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষত চিত্রকল্পের ব্যবহারে নিঃসন্দেহে 'দুপুর' একটি গুরুত্বপূর্ণ গল্প।

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Can the Subaltern Speak?'[৫৪]-এর দ্বিতীয়ার্ধে বলেন, মেয়েদের যে শরীরটাকে ঘিরে পিতৃতন্ত্রের হাজারো নীতি নিয়ম, যাকে শুদ্ধ রাখতে, পবিত্র রাখতে কখনো পরদা কখনো বা চিতার আগুনের বিধান, সেই শরীরকেই কিন্তু কোনো বিরল মুহূর্তে ব্যবহার করে মেয়েরা নিরুচ্চারিতকে উচ্চারণ করে তুলতে। গায়ত্রী তাঁর এই ভাবনায় পৌঁছেছিলেন মহাশ্বেতা দেবীর কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাস পুনর্বার পাঠ এবং অনুবাদের সূত্রে। মহাশ্বেতার গল্পে শরীর যখন চিৎকার করে কথা বলে তখন তা আর শুধুই শরীর থাকে না। চিত্রকল্পগুলি ছাপিয়ে যায় অস্তিত্বের মানুষী সীমানা। 'স্তনদায়িনী'[৫৫] গল্পে কাঙালীচরণের স্ত্রী যশোদার চরিত্রটিই গড়ে তোলেন মহাশ্বেতা কৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদার মিথ ভেঙে। বাসুদেব এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শিশু কৃষ্ণকে আপন পুত্র জ্ঞানে স্তনদুগ্ধে লালন করেছিলেন যশোদা। সেদিন তিনি জানতেনও না এই পুত্র একদিন জগতের ত্রাতা হবে কিন্তু আর কখনো ফিরে আসবে না বৃন্দাবনে, আপন মাতৃক্রোড়ে। মিথটা ভেঙে যায় গল্পের শুরুতেই যখন যশোদার পরিচয় দেওয়া হয়— "যশোদা পেশায় জননী, প্রফেশনাল মাদার।" মিথটা ভাঙে, কিন্তু আর একটি মিথ নিঃশব্দে গড়ে চলেন লেখিকা। তাঁর যশোদা পুত্রের পরিচয়ে খ্যাত কৃষ্ণজননী নয়, ধরিত্রীমাতা, স্বয়ং পৃথিবী। ঘটনাচক্রে যশোদার স্বামী করালীচরণের পা কাটা গেলে এবং হালদারদের বিশাল গুষ্টির ক্রমবর্ধমান নবজাতকদের সামলাতে যশোদা হয়ে বসে হালদারবাড়ির 'দুধ মা'। কিন্তু কালের নিয়মে এক সময় তার গর্ভধারণের ক্ষমতা শেষ হয়। হালদারবাড়ির মধ্যযুগীয় পরিবেশেও ক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে, গর্ভনিরোধক আর নিষিদ্ধ থাকে না সেখানে, প্রয়োজন ফুরোয় দুধ-মায়ের। এতকাল দুগ্ধদানের মহিমায় বিভোর যশোদা সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখে তাকে আশ্রয় দেওয়ার মতো কেউ তার পাশে নেই। ফসল কেটে নেওয়া জমির মতো; নিঃস্ব, পরিত্যক্ত খাদানের মতো একা পড়ে থাকে যশোদা। আর তারপর তার প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী স্তনে ক্যানসার ধরা পড়ে। রোগের লক্ষণ বৃদ্ধি পেলে হালদার কর্তারা উদ্যোগী হয়ে তাকে ভর্তি করে দেন হাসপাতালে। পচন ধরা স্তনের অমানুষিক যন্ত্রণায় সে কখনো চিৎকার করে, কখনো আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে হাসপাতালের বিছানায়। আর

তার পরের চিত্রকল্পটিতে যশোদা হয়ে ওঠে ধ্বস্ত পৃথিবীর প্রতিরূপ, "ক্রমে যশোদার বাম স্তন ফেটে আগ্নেয়গিরির ক্রেটার-সদৃশ হল। পুতিগন্ধে কাছে যেতে কষ্ট হয়।" আগ্নেয়গিরির নির্গলিত লাভাস্রোত যেন সর্বংসহা পৃথিবীর ওপর মানুষী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিশোধ।

একটি প্রাচীন লাতিন প্রবাদ বলে, 'Woman is nothing but womb'[৫৬] এই শরীর সর্বস্বতাকে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করে মানবীবিদ্যার তাত্ত্বিক তথা ভাবুকেরা বলেন, সেখান থেকেই তাঁরা সৃষ্টি করবেন, ". . . out of my Womb thou salt brought"[৫৭] সন্তান প্রসবের যন্ত্রণাকে প্রতিবাদের ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী তাঁর *হাজার চুরাশির মা* উপন্যাসে। কবিতা সিংহের *'কনকের আপনজন'*[৫৮] গল্পে এমনই এক চিত্রকল্পের অসামান্য ব্যবহার দেখি। কনক তার স্বামীর চাকরিস্থল দিল্লীতে নতুন করে সংসার শুরু করতে গিয়েও কিছুদিনের মধ্যেই ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসে। কারণ সে বুঝতে পারে সহকর্মিণী শোভার সঙ্গে তার স্বামী দিলীপের সম্পর্কটা তাদের দাম্পত্যের চৌকাঠের বাইরে আর কিছুতেই আটকে রাখা যাবে না এবং কলকাতা থেকে দিল্লীর ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার নেওয়াটাও হয়তো পূর্বপরিকল্পিত। যেহেতু কনক তার কলকাতার চাকরিতে তখনও ইস্তফা দেয়নি তাই সেটিকেই খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সমস্ত সিদ্ধান্তই তাকে মন স্থির রেখে, আবেগকে সংযত রেখে নিতে হয়েছিল কারণ নাবালক পুত্রের এবং তার নিজের বাকি জীবন এর ওপর নির্ভর করছে। ফিরে এসে চাকরিতে যোগ দেওয়া পর্যন্ত মনের ওপর থেকে রাস আলগা করার অবকাশ সে পায়নি। আর তারপর তাকে একটু একটু করে শিখতে হয় নিজেকে বাঁচিয়ে চলার কৌশল। তার পরিচিত পাড়ার কলেজ পড়ুয়া প্রতিবেশিনীর কথায়, অফিসে টিফিন ভাগ করে খাওয়া বহু বছরের সহকর্মিণীর প্রশ্নে, বাসে হঠাৎ দেখা হওয়া স্বামীর পুরনো সহকর্মীর দৃষ্টিতে কনক দেখে উদগ্র কৌতূহল, প্রশ্নের লুকোনো বাঘনখ এবং কেচ্ছার মাংসগন্ধে অদৃশ্য লালাক্ষরণ। এরা সকলেই শিক্ষিত ভদ্রলোক তাই সরাসরি কেউ কিছু বলে না। কিন্তু কনক বোঝে নিরীহ প্রশ্নের গভীরে লুকিয়ে আছে গোপন বিষদাঁত। সারাদিন নিজেকে বাঁচিয়ে, বুকের গভীরের কাঁচা ক্ষতগুলিকে দুহাতে আগলে দিনের শেষে যখন একা হতে পারে কনক তখন সে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। সেই সময় তার কাছে পাশের বস্তির মেয়ে রেশমী আসে ইস্ত্রি করা জামাকাপড় দিতে। রেশমী তার স্বামীর অত্যাচারের কথা বরাবর বলে এসেছে কনকের কাছে, দেখিয়েছে মারের চিহ্ন। আজ রেশমীর শরীরের আঘাতচিহ্নগুলি যেন কনকের লুকোনো আঘাতগুলিকে টেনে বের করে আনে। কনকের সেই হাহাকারে ভেঙে পড়াকে এমন এক চিত্রকল্পে ব্যক্ত করেন যা থেকে বোঝা যায় এই যন্ত্রণা একান্তই নারীর—". . . একটা অবোলা জন্তুর মতো হু হু করে কেঁদে উঠল। তার অর্ধেক কথা বোঝা যাচ্ছিল, অর্ধেক হারিয়ে যাচ্ছিল কান্নায়। বোঝা যাওয়া শব্দগুলো অসম্পূর্ণ, গেঁয়ো আর একদম রং না মাখা। ভিতর থেকে যেমন উঠছিল ঠিক তেমনিভাবে অবিকল নাড়ি জড়ানো রক্তমাখা উলঙ্গ প্রসব হতে থাকছিল।" স্বামীর সন্তানকে একসময় দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছিল কনক, তেমন স্বামীর দেওয়া প্রত্যাখ্যান এবং অপমানের যন্ত্রণাকেও সে নিরুচ্চারে বহন করে। কিন্তু একটা সময়ের পর গর্ভের সন্তানের মতো তা তাকে নির্গলিত করতেই হয়।

অবশ্য এমনও নয় যে নারী লেখকেরা শুধু মেয়েদের অনুভূতিকেই ভাষা দিয়েছেন, মেয়েদের দৃষ্টিকোণে ধরা জীবনই তাঁদের লেখায় চিত্রকল্পের রূপ পেয়েছে। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান থেকে 'পরমা'[৫৯] গল্পটি লেখেন বাণী বসু। এর কথক এমন একজন পুরুষ যে তার প্রিয় নারীকে নিয়ে প্রবল রকমের রক্ষণশীল এবং অধিকার সচেতন। অবশ্য পুরুষের সন্দেহের জালে আটকে পড়ে যাওয়া একটি মেয়ের ছটফটানি বা সম্পর্কের বেড়ে ওঠা তিক্ততা এই গল্পের বিষয় নয়। গল্পটি শুরুই হয় সম্পর্কটি অন্তত আপাতদৃষ্টিতে শেষ হওয়ার পর যুগ পেরিয়ে। কর্মসূত্রে পনের বছর পুনের বাসিন্দা সুকু ওরফে সুকুমার সেখানে স্ত্রী সন্তান সমেত তার গোছানো সংসার। তবু বার বার কোনো অলীক সুখের টানে কিংবা হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে সে ফিরে ফিরে আসে কলকাতায়। সেখানে কৈশোরের, প্রথম যৌবনের রাস্তায় একা হাঁটে আর ভাবে রঞ্জুর কথা। যে রঞ্জু তার জীবনের প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র প্রেম। যে রঞ্জুকে সে আগলে রাখতে চেয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের দৃষ্টি থেকে, স্পর্শ থেকে। তাই কলেজের গেটে অপরিচিত কোনো যুবকের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করেছে রঞ্জুকে, ভিড়ের মধ্যে কোনো পুরুষ তাকে স্পর্শ করলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই রক্ষাকারীর বলিষ্ঠ হাত রঞ্জুকে নির্ভরতা দেয়নি বরং ফাঁসের মতো চেপে বসেছে তার কণ্ঠে। শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে সরে যায় রঞ্জু। কিন্তু সুকুমারের হৃদয়ে অদৃশ্য বঁড়শিটি বিঁধেই থাকে যার টানে তাকে বারবার ফিরে আসতে হয় রক্তাক্ত, গ্লানিময় স্মৃতির কাছে। সেই অমোঘ টানেই কলকাতা থেকে শহরতলিতে পৌঁছে যায় সুকুমার, যেখানে রঞ্জু তার শিল্পী স্বামীর সঙ্গে সংসার পেতেছে একটি ছোট্ট বাগানঘেরা বাড়িতে। একবার সে দেখতে চায় এই নতুন রঞ্জুকে, হয়তো তার মোহজাল তাতে ছিন্ন হবে। হারানো প্রেমিকাকে নতুন করে ফিরে দেখার মুহূর্তটি ধরা থাকে একটি চিত্রকল্পে— ''সুরঞ্জনা তো অবিকল তেমনি আছে। মাথার ওপর কালপুরুষ, পায়ের তলায় দিবারাত্রির গতিভঙ্গে ঘূর্ণিত হচ্ছে পৃথিবী, আলোকলতার আকর্ষের মতো বাহু দুলছে, ফুলন্ত ডালের মতো বঙ্কিম ঠামের বাঙ্ময় চলনভঙ্গি, সর্পিল বেণি সেই বহু বছর আগেকার কুমারী নদীর ভঙ্গিতে গ্রীবার পাশ দিয়ে পথ কেটে বুকের কমনীয় অববাহিকায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলুম উনিশ বছরের তরুণী সুরঞ্জনা অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন্ ছায়াপথ থেকে ম্যারাথন যাত্রা করে অর্বুদার্বুদ আলোকবর্ষ দূরের কোন্ জ্যোতির্লোকের দিকে অন্তহীন চলেছে। ত্বরাহীন। আত্মমগ্ন। . . .'' চিত্রকল্প মুহূর্তে গল্পটিকে দেয় এক অবিশ্বাস্য উড়ান, প্রেম-অপ্রেমের টানাপোড়েন থেকে সেটি পৌঁছে যায় চরাচরব্যাপী অস্তিত্বে। প্রেমিকাকে দু'হাতের মধ্যে একদিন বন্দি করতে চেয়েছিল সুকুমার, আজ দেখে, সে অনন্ত— তাকে পাওয়ার নেই, হারানোরও নেই। এই চিত্রকল্পে 'সুরঞ্জনা' নামটি এবং তার নক্ষত্রবিহারী সত্তা অবধারিত ভাবে মনে আনে জীবনানন্দের কবিতার বিখ্যাত কটি পংক্তি—

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা,
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে...[৬০]

এইভাবে উত্তরাধিকারকে স্বীকার করে মানুষী প্রেমের অনন্ত যাত্রা।

আজকের সময়ের গল্পকারদের মধ্যে চিত্রকল্প বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে এসেছে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের লেখায়। তাঁর 'শহরে বৃষ্টি আসে'[৬১] গল্পের মন্মথ চাকীর আধুনিক নগরায়নের দিকে দ্রুত ধাবমান এক শহরের প্রাচীন নাগরিক। শুধু বয়সের বিচারে প্রবীণ নন, তিনি বিগত সময়ের সঙ্গে এক গভীর সম্পৃক্ততা অনুভব করেন, তার মধ্যে বাঁচতে ভালোবাসেন। বহু পুরনো এক শরিকী বাড়িতে তাঁর বাস, শোবার ঘরের জানালার বাইরে পায়রাদের সুরেলা বিশ্রম্ভালাপ, তাদেরই বিষ্ঠায় ভরা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে প্রতিদিন ওঠানামা তাঁকে গভীর স্বস্তি দেয়। অবসর নেওয়ার আগে তিনি পেশায় ছিলেন পৌর সংস্থার কেরানি কিন্তু নেশায় ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু। এই শহরের ইতিহাস তিনি রচনা করেন কিছু তথ্য, কিছু কল্পনায় মিশিয়ে। তিনি দেখান এই শহর একসময় সুন্দরবনের অংশ ছিল, এখানে ছিল রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ের সমৃদ্ধ নদীবন্দর। লেখাটি স্থানীয় পত্রিকায় ছাপানোর সুবাদে তিনি হয়ে যান ড. এম. চাকী। কল্পিত ইতিহাসের মতোই এই কল্পিত উপাধিতে তিনি গর্বিত, আত্মতৃপ্ত বোধ করেন। নবলব্ধ পরিচয়টি কাঠের ফলকে তাঁর জীর্ণ দরজায় শোভা পেতে থাকে। মন্মথ চাকীর সময়ের অবধারিত স্রোতকে অস্বীকার করতে চান তাই সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে বাঁদিকের যে রাস্তা স্টেশন অভিমুখে গেছে, যেখানে লোকাল ট্রেন দফায় দফায় মানুষ বমি করে, আর সেই মানুষেরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে নতুন গজিয়ে ওঠা দোকান বাজারের উদ্দেশ্যে, সেই রাস্তা এড়িয়ে যান। বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য অপর শরিকদের কাছে ঠকে গেছে, এই ধারণায় মন্মথ চাকীর পুত্র যখন নেমপ্লেটটা খুলে ফেলে দিতে চায় তখন চাকীমশাই পাঁজরের মতো সেটিকে আগলে রাখতে চান। তিনি যতই নিজেকে আড়াল করতে চান, অতীতের কুম্ভের মধ্যে হাত গলিয়ে শহরের জিনের খোঁজে নিমগ্ন থাকতে চান ততই হড়পা বানের মতো সময়ের স্রোত তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন ভেসে গেলেন যেদিন মধ্যরাতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে পঞ্চুর নিহত হওয়ার খবর শোনায়। পাড়ায় পঞ্চুর সেলুন বহু পুরনো। চাকী মশাই তার কাছে গিয়েই নাপিতের প্রয়োজনটা মেটাতেন, সেদিনও গিয়েছিলেন এবং ঘটনাচক্রে তিনিই ছিলেন শেষ খদ্দের। পুলিশ তাঁকে সেই নৃশংস খুনের বিবরণ দিয়ে যখন বলে শহরটা নরক হয়ে গেছে, তখন নিমেষে এম. চাকীর অতীতের খড়কুটো সংগ্রহ করে গড়ে তোলা জগৎটি নিঃসাড়ে ভেঙে পড়ে। শহরের শিকড় খোঁজা মানুষটির ভোগ্যপণ্যের বৃষ্টিতে সিক্ত হওয়া এক অসামান্য চিত্রকল্পে ধরা পড়ে— "এম. চাকী যেন চাপা পলি ভেদ করে আধুনিক অপরিচিত ভূত্বকে দাঁড়িয়ে, মধ্যরাতের যাত্রায় দেখতে পেলেন আকাশে বৃষ্টি। শহরটি উল্টে মাধ্যাকর্ষণ হারিয়ে মেঘ হয়ে ঝুলছে। কেবল নিয়ন আলোর রঙে জলদরেখা উজ্জ্বল। টনসিল ফোলা মানুষদের হাত থেকে ক্রমাগত স্খলিত হয়ে সোজা, নাচতে নাচতে বাঁকানো বিভঙ্গে ঝরে পড়ছে ব্রিফকেস, টিভি, ক্যাডবেরি, নেলপালিশ, সাবান, পাফযুক্ত ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, বিদেশী কসমেটিক্স, ভিসিপি এবং ক্ষুর-ছুরি-কাঁচি ও চিরুনির বর্ষণ। রিমঝিম রিমঝিম।"

জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'শেষকথা'[৬২] নামে একটি গল্প লিখেছিলেন যার একটি ভিন্ন পাঠও মেলে 'ছোটগল্প'[৬৩] নামে। এর সূচনায় তিনি বলেন, মানুষের জীবনটা যদি বনস্পতি হয় তবে ছোটগল্প হল তার ফল। যার ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে ধরা থাকে একটি বনস্পতির বেড়ে ওঠার ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এই সূত্র ধরে এমনটা হয়তো বলা যায়, ফলটি যদি

ছোটগল্প হয় তবে তার অন্তর্গত বীজ হল চিত্রকল্প। অতি ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর তার আকৃতি, কিন্তু সে জন্ম দিতে পারে নতুন এক বনস্পতির, সৃষ্টি করতে পারে একটি অরণ্য। উনিশ শতকের শেষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত নির্বাচিত কিছু গল্পের আলোচনায় চিত্রকল্পের সেই বিপুল সম্ভাবনাকে, নিগূঢ় রহস্যকে খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

আলোচনার শেষ পর্বে ধারাবাহিকতায় কিছু ছেদ পড়েছে বলে মনে হতে পারে। সত্তরের পরবর্তী গল্পকারদের উপস্থিতি লক্ষণীয় ভবে কম কেন, এই প্রশ্ন জাগতে পারে। এর কারণ, গল্প পড়তে গিয়ে দেখেছি ইদানীংকার গল্পকারেরা নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেও চিত্রকল্পের সঙ্গে তাঁদের সম্পৃক্ততা ক্রমশ কমে এসেছে। একটি চিত্রকল্প পুরো গল্পটিকে শিরদাঁড়ার মতো ধরে রেখেছে এমনটা আর প্রায় দেখাই যায় না। গল্পের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে নিঃসন্দেহে, শহুরে মানুষের আন্তর্জালে অভ্যস্ত ভার্চুয়াল জগৎ থেকে শুরু করে নিম্নবর্গীয়ের জীবন তাদের ভাঙাচোরা ঘর-গেরস্থালির ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠছে অনেক সম্ভাবনাময় লেখকের কলমে। হয়তো আনুভূমিক বিচরণের ক্ষেত্রটাকে তাঁরা টেনে হিঁচড়ে অনেকটা বড় করে নিতে পেরেছেন বলেই একই পুকুরে বার বার ঢিল ফেলে আবর্ত সৃষ্টি হতে দেখায় আর তাঁদের তেমন আগ্রহ নেই। তাঁরা হয়তো আর দেখতে বা দেখাতে চান না,

> ... দেখি মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায়
> নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
> ভেঙে ভেঙে যায়।[৬৪]

সবশেষে, স্বীকার করতেই হবে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ। অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখককে বাদ দেওয়ার গুরুভার অপরাধবোধ মনে নিয়েই প্রবন্ধের পরিসরে বিষয়টিকে আঁটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হয়েছে। প্রতিটি মুখ এবং তার অভিব্যক্তি যেমন আলাদা, প্রতিটি গল্প এবং তাতে গড়ে ওঠা চিত্রকল্পও তেমন স্বতন্ত্র; দুটিকে মিলিয়ে না দেখাতে পারলে কিছুই বুঝিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র উল্লেখ তাই অর্থহীন। সেই কারণে, অনালোচিত লেখকেরা অনুচ্চারিতই রইলেন। ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিসরে এই অসম্পূর্ণতাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করে তোলার আশা রইল।

তথ্যসূত্র

১. Ezra Pound, 'A Few Don'ts by an Imagiste' *Poetry* (Chicago), 1 (1913), pp. 198-206, Reprinted, *The Modern Tradition*, Ed. Richard Ellmann and Charles Feidelson, Oxford University Press, 1965, Fifth Printing 1973, pp 143-145

২. বুদ্ধদেব বসু, 'সংস্কৃত কবিতা ও আধুনিক যুগ', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, দে'জ পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৬, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

৩. Ezra Pound, ''Vorticism', Gaudier-Brzesks (1916), Reprinted, *The Modern Tradition*, Ed. Richard Ellmann and Charles Feidelson, Oxford University Press, 1965, Fifth Printing 1973, pp 145-152

৪. C. Day. Lewis, 'The Nature of the Image', *The Poetic Image*, Printed in Great Britain in the City of Oxford at the Alden Press, First Published 1947, Tenth Impression 1961

৫. তদেব

৬. Caroline F. E. Spurgeon, *Shakespeare's Imagery and what it tells Us*, Cambridge University Press, First Edition 1935, American Edition 1935

৭. Frank O' Connor, 'Introduction', *The Lonely Voice*, Macmillan & Co Ltd, London, 1963

৮. David Magarshack, 'Introduction', *Lady with Lapdog and Other Stories*, Anton Chekhov, Penguin Classics, London, First published 1964

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শ্রীকণ্ঠ সিংহ', *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ১৩১৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৬

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাহিরে যাত্রা', *জীবনস্মৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রথম প্রকাশ ১৩১৯, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৬

১১. Sudhir Kakar, 'Art and Psyche: the Painting', *Young Tagore: The Making of a Genius*, First published in Viking by Penguin Books 2013

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ : ২য় খণ্ড*, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৬৭

১৩. তদেব

১৪. তদেব

১৫. বুদ্ধদেব বসু, 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি', *রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য*, নিউ এজ পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৬২

১৬. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ

১৭. তদেব

১৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ : ২য় খণ্ড*, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৬৭

১৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, একাদশ মুদ্রণ, ১৪০১

২০. তদেব

২১. জগদীশ গুপ্ত, *জগদীশ গুপ্তর গল্প*, সম্পা: সুবীর রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ ১৯৯৬

২২. তদেব

২৩. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকা: সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, *পঞ্চাশটি গল্প*, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩

২৪. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, সপ্তদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৫

২৫. তদেব

২৬. প্রেমেন্দ্র মিত্র, 'দুপুর' *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, দে'জ প্রথম সংস্করণ ১৯৮৪
২৭. প্রেমেন্দ্র মিত্র, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, নাভানা, পরিবর্তিত সং ১৯৮৯
২৮. তদেব
২৯. বুদ্ধদেব বসু, 'কঙ্কাবতী', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ ১৯৯৪
৩০. বুদ্ধদেব বসু, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০০
৩১. তদেব
৩২. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০২
৩৩. সৈয়দ মুজতবা আলী, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, বাক সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, দশম মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৩
৩৪. তদেব
৩৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী, *সোনা রূপা নয়*, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮০
৩৬. সুবোধ ঘোষ, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, প্রকাশ ভবন, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০১
৩৭. তদেব
৩৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, *নির্বাচিত গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯
৩৯. তদেব
৪০. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আমার সাহিত্যজীবন আমার উপন্যাস', *দেশ সাহিত্য সংখ্যা* ১৩৮২
৪১. বিমল কর, *পঞ্চাশটি গল্প*, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৫
৪২. তদেব
৪৩. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'একটুখানি বেঁচে থাকা', *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩
৪৪. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০০
৪৫. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'একটুখানি বেঁচে থাকা', *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩
৪৬. জীবনানন্দ দাশ, 'আট বছর আগের একদিন', শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, প্রথম ভারবি সংস্করণ ১৯৬৬
৪৭. শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০০
৪৮. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, 'আমার লেখা', *দেশ সাহিত্য সংখ্যা*, ১৩৮৩
৪৯. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৩
৫০. মতি নন্দী, *ছোটগল্প সমগ্র*, দীপ প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪১৯
৫১. অসীম রায়, *গল্প সমগ্র, ২য় খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৪
৫২. বিমল কর, *আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৯২
৫৩. দেবেশ রায়, *গল্প সমগ্র ১ম খণ্ড*, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং ২০০০
৫৪. 'Can the Subaltern Speak?' appears as the closing section of a chapter entitled 'History' in Gaytri Chakraborty Spivak's, *A Critique of Postcolonial Reasons : Towards a History of the Vanishing Present*, Cambridge : Harvard University Press, 1999

৫৫. মহাশ্বেতা দেবী, *স্তনদায়িনী এবং অন্যান্য গল্প*, করুণা প্রকাশনন, প্রথম করুণা সংস্করণ ১৯৯৭

৫৬. Raman Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*, Pearson Education, Fifth Edition 2005

৫৭. Sandra Gilbert and Susan Guber, *The Madwoman in the Attic*, First published as Yale Nota Bene Book in 2000

৫৮. কবিতা সিংহ, *পঞ্চাশটি গল্প*, সহজ পাঠ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩

৫৯. বাণী বসু, *মুহূর্তকথা*, পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ ২০১০

৬০. জীবনানন্দ দাশ, 'আকাশলীনা', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, ভারবি, প্রথম ভারবি সংস্করণ ১৯৬৬

৬১. সাধন চট্টোপাধ্যায়, *শ্রেষ্ঠ গল্প*, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৭

৬২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ, ৪র্থ খণ্ড*, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৩৬৭

৬৩. তদেব

৬৪. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'ফলতায় রবিবার', *শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, নবম সংস্করণ ১৯৯২